The Jahangirnagar Review, Part-C, Vol. XXXII, pp 159-181, ISSN 2306-3920

নকশি কাঁথা শিল্পের ঐতিহ্য অনুসন্ধান ও সরূপ বিশ্লেষণ

ফারহানা তাবাস্‌সুম*

[সার-সংক্ষেপ : গ্রাম বাংলাদেশের পল্লী রমনির হাতে তৈরি নকশি কাঁথার ঐতিহ্য নির্ণয় কোন একটা নির্দিষ্ট মানদন্ডে বিচার করা যায় না তেমনি এর শিল্প গুনের পরিধি এতটাই বিশাল যে স্বল্প পরিসরে এর বর্ণনাও সম্ভবপর নয়। এটি এমন এক শিল্পকলা যেখানে একজন নারী তার আবেগকে বিভিন্ন ফর্ম, মোটিফ, নকশার মাধ্যমে রঙের খেলায় প্রকাশ করে। কোন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই তৈরি সমস্ত নকশি কাঁথার অন্তর্নিহিত বক্তব্যের মধ্যে ফুটে ওঠে আমাদের বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতিচ্ছবি।]

নকশি কাঁথা গ্রাম বাংলার লোক ঐতিহ্যের অন্যতম নিদর্শণ। অন্তঃপুরবাসিনী নারী তার গৃহস্থালী কাজের অবসরে কাঁথা সেলাই করেন। রঙিন সুতা ও সূচের চলমান প্রক্রিয়ায় মনের মাধুরী মিশিয়ে নকশা গড়েন, তৈরী করেন নকশি কাঁথা। এ কাঁথা সম্পূর্ণরূপে নারীর একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি। এক একটি নকশি কাঁথা যেন এক এক জন পল্লী রমণীর মনোজগতের গভীর অন্তঃদৃষ্টির ছবি। এই সনাতন সূচীকর্ম সৃষ্টি হয়েছিল প্রিয়জনকে উপহার বা ভালবাসার নিদর্শন স্বরুপ অথবা কখনো শুধুমাত্র নিজ গৃহে ব্যবহার করার জন্য। এ কাঁথা কখনো বাজারে বিক্রয়ের জন্য তৈরী হয়নি, তবে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কাঁথা সেলাই করিয়ে নেওয়ার প্রচলন ছিল।

এ কাঁথা এখনও বাংলাদেশের সর্বত্র সাধারণ মানুষেরা ব্যবহার করে। সারি সারি কাঁথা ফোঁড়ে তৈরি সাধারণ কাঁথা, দক্ষ গৃহবধূর পটু হাতে রূপান্তরিত হয় নকশি কাঁথায়। সে সাধারণ কাঁথা ফোঁড়ের স্বকীয় ব্যবহারে সৃষ্টি করতে পারে বৈচিত্র্যময় বুনট। সর্বোৎকৃষ্ট নকশি কাঁথা পুরানো ন্যাকরাকে রূপান্তরিত করে শিল্পকর্মে, যেখানে মোটিফের সমৃদ্ধি এবং শাড়ির পাড়ের নকশার পাশাপাশি স্থান পায় লোককাহিনী এবং গৃহস্থালী অথবা কৃষিভিত্তিক জীবনের দৃশ্যাবলি যা কাঁথায় ব্যবহৃত সামগ্রীর তুচ্ছতাকে আচ্ছন্ন করে। কাঁথার রয়েছে নানামুখী ব্যবহার - মোড়ক ও ঢাকনা, বিছানায় বিছানোর বা মেঝেতে ছড়িয়ে দেওয়ার চাদর, প্রসাধন সামগ্রীর ও পোষাকের মোড়ক, বালিশ বা বাসনপত্রের ঢাকনা। সর্বোৎকৃষ্ট নকশি কাঁথা বিবাহ উৎসব উপলক্ষে তৈরি হতো; কনের জন্য উপহার হিসেবে বা বরকে স্বাগতম জানাতে বাংলার নারীদের শিল্পের এ উদাহরণে প্রকাশ পায় তাদের শৈল্পিক গুণাবলী ও ধৈর্য। [জামান : ২০০৭: ৫৪৬]

কাঁথা শব্দের আভিধানিক অর্থ জীর্ণ বস্ত্রের তৈরি মোটা শীতবস্ত্র বিশেষ। অলংকৃত কাঁথার গ্রামীণ নাম খেতা, খাতা, খাঁতা, কেতা, ফুল কাঁটা খেতা, সাজের কাঁথা বা নকশিকাঁথা। সংস্কৃত শব্দ 'কন্থা' এবং প্রাকৃত শব্দ 'কতথা' অথবা 'কথতা' থেকে বাংলায় কাঁথা শব্দের উৎপত্তি। [গোপ: ২০১৬: ০৮] সাধারণ কাঁথায় যখন নকশা করা হয়, তখন তা নকশিকাঁথা নামে পরিচিতি পায়। নকশিকাঁথায় নারীর ভূমিকা একচেটিয়া। গ্রাম-বাংলার নারীর হাতেই নকশিকাঁথা সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের হাতেই এর

* **ফারহানা তাবাস্‌সুম :** সহকারী অধ্যাপক, চারুকলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

বিকাশ। সাধারণত পুরাতন বস্ত্র দিয়ে কাঁথার জমিন তৈরি হলেও নকশার কাজে রঙিন সুতার এক একটি ফোঁড়ই নকশিকাঁথার মূল প্রাণশক্তি।

সাধারণভাবে গ্রামের বিভিন্ন বয়সী নারী ঘর-গেরস্থালির কাজের অবসরে নকশিকাঁথা তৈরি করে থাকে। শুধু বিছানায় বিছানোর জন্য বা গায়ে দেবার জন্য নয়- এর আরো অনেক ব্যবহারিক দিক আছে। যেমন- পালকিতে বিছাবার জন্য এক বিশেষ ধরনের নকশিকাঁথা তৈরি করা হয়। আবার বিয়ের আসর বা বিছানায় শখ করে বিছানো হয় যে কাঁথা, তার নাম 'পাড়নি কথা'। এ ছাড়াও নকশি আসন, নকশি জায়নামাজ, নকশি দস্তরখানা, বর আসন, কনের আসন, বালিশের আবরণ, আয়না-চিরুনি/পান-সুপারি রাখার জন্য আরশিলতা বা বটুয়া ইত্যাদি শ্রেণীর কাঁথা তৈরি হয়ে থাকে। গুরু সদয় দত্ত, জসীমউদ্দীন, দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ লেখক-গবেষক এই সব কাঁথার নানা ধরনের শ্রেণীকরণ ও নামকরণের উল্লেখ করেছেন। তাঁদের প্রদত্ত তথ্যের ভেতর কিছু ভিন্নতা আছে। এখানে আমাদের শুধু এইটুকু জানলেই চলবে যে, এই সব নামকরণ/শ্রেণীকরণ হয়েছে আঞ্চলিকভাবে সংগৃহীত নামের ভিত্তিতে। তাদের বর্ণিত কাঁথার নামের ভিন্নতা থাকলেও ব্যবহারিক দিক দিয়ে পার্থক্য সামান্যই।

কাঁথার আয়তনের কোনো নির্দিষ্ট মাপ নেই। প্রয়োজনমতো ছোট-বড় হতে পারে। আর কাঁথায় ব্যবহৃত মোটিফের কোনো পরিসীমা নেই। নকশিকাঁথায় নানা ধরনের বিচিত্র মোটিফ ব্যবহৃত হয়। আকন্দ: ২০১৩: ৭৮]

সাধারণত কয়েকটি পুরানো কাপড় শাড়ি, লুঙ্গি, ধুতি ইত্যাদি) জোড়া দিয়ে সেলাই করে কাঁথা প্রস্তুত করা হয়। খ্রিস্টপূর্বকাল থেকে বাংলায় কন্থা বা কাঁথার প্রচলন আছে বলে জানা যায়। পাণিনির ব্যকরণ এবং অন্যান্য সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থে কাঁথার উল্লেখ আছে। নাথ সাহিত্যে, গোপীনাথের গানেও কাঁথার উল্লেখ আছে। তবে এগুলো চিত্রিত বা নকশিকাঁথা ছিল কি না, তা জানা যায় না। তবে কাঁথার প্রাচীনতা অস্বীকারও করা যায় না।

নকশিকাঁথা বাংলাদেশের লোকজীবনের জনমানুষের লোকসংস্কৃতির এক অনন্য-উপাদান। নকশিকাঁথা শিল্প বাংলার প্রাচীনতম লোকজ ঐতিহ্য। সূচিশিল্পের এ ঐতিহ্য অন্তত তিন হাজার বছরের পুরোনো বলে ধারণা করা হয়। হৃদয়ের গভীর লুকিয়ে থাকা সৌন্দর্যপ্রিয়তাকে শৈল্পিকভাবে প্রকাশ করতে এ শিল্পের যাত্রা শুরু হয়েছিল। নকশিকাঁথা বাংলাদেশের লোকজীবনের জনমানুষের লোকসংস্কৃতির এক অনন্য- উপাদান কাঁথা তৈরীর সূচনা হয় যখন পুরানো কাপড় ও সুঁচ সহজলভ্য হয়। অতীতে ঋগবেদ এ পর্যন্ত সুঁচ-এর উল্লেখ আছে এবং পরিহিত পোশাকে প্রায়ই সূচিকর্মের উল্লেখ আছে। মেগাসথিনিস তার লেখায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভা সম্বন্ধে উল্লেখ করেন, অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা স্বর্ণ দিয়ে কাজ করা ও মূল্যবান পাথর শোভিত এবং ফুল তোলা মিহি মসলিনের পোশাক পরিধান করতেন। বাংলার পোড়ামাটি ও ব্রোঞ্জের ভাস্কর্যে দেখা যায় যে অভিজাত ব্যক্তিগণ ফুল তোলা পোশাক পরিধান করতেন। বাংলার কাঁথা সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত-এ, যা আনুমানিক ৫০০ বছর আগে রচিত, যেখানে উল্লেখ করা হয়েছে শ্রী চৈতন্যের মাতা তাঁর নিকট একটি কাঁথা পাঠিয়েছিলেন। মাঞ্জারী মহান্তির মতে এ কাঁথাটি পুরিতে সংরক্ষিত আছে। কিন্তু ব্যবহারিক কাঁথা শিল্পকর্ম নয়। অধিকন্তু কাঁথা তৈরির উপকরণ পুরানো ছেড়া কাপড়। তাই স্বাভাবিকভাবে কাঁথা সম্বন্ধে প্রাথমিক উল্লেখ শ্রদ্ধাজ্ঞাপক ছিল না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাঁথার সাথে দারিদ্রকে জড়িত করা হতো। উদাহরণস্বরূপ উপকথার রাজা গোপিচন্দ্রের বর্ণনায় আছে যে, তিনি তপস্বী হয়ে একটি কাঁথা গ্রহণ করেছিলেন। কাঁথা এবং সন্ন্যাসের সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে 'শনৈঃ কন্থা/শনৈঃ পন্থা/শনৈঃ পর্বতলজ্যম।' কিন্তু ঠিক কখন সাধারণ ব্যবহার উপযোগী কাঁথা নকশি কাঁথার স্তরে উত্তীর্ণ হয় তা লিপিবদ্ধ নাই। ব্যবহৃত উপকরণের প্রকৃতি এবং বাংলার জলবায়ুর কারণে স্বাভাবিক অবস্থায় কাঁথা দ্রুত বিনষ্ট হয়ে যায়। ১৬২৯ সালে পর্তুগিজ

মিশনারি সেবাস্তিয়ান ম্যানরিক-এর লেখা থেকে জানা যায় যে, বাংলা থেকে যেসব জিনিস নিয়ে পর্তুগিজরা ব্যবসা করত তার অধিকাংশই ছিল লেপ, চাঁদোয়া, বিছানার চাদর ও শিকারের দৃশ্য সংবলিত সূচিশিল্পের কারুকার্য-শোভিত জিনিস। বিশেষ করে ক্রেতাদের কাছে আকর্ষণীয় ছিল বাংলার লোকশিল্পজাত সুচিশিল্প। [বসাক : ২০০২: ৪]

বাংলার নকশি কাঁথার সর্বপ্রাচীন উদাহরণগুলি সেহেতু দেশী নয়, এগুলি ষোড়শ শতাব্দীর বেঙ্গালা বা সাতগঞ্জ কাঁথা যেগুলি পর্তুগিজদের নিন্দেশে তৈরি করা হয়। আধুনিক কলকাতার ২৩ মাইল উত্তরে হুগলি জেলার সাতগাঁও-এ প্রস্তুতকৃত এ কাঁথাগুলি হলুদ তসর বা মুগা সিল্ক দিয়ে চেইন সেলাইয়ে নকশি করা হয় সুতি অথবা পাটের জমিনের উপর, বিষয় নির্বাচনে রয়েছে সুস্পষ্ট পর্তুগিজ প্রভাব যদিও ভারতীয় মানব অবয়ব এবং প্রাণীও রয়েছে। [জামান : ২০০৭: ৫৪৭]।

ভারতীয়-পর্তুগিজ কাথার সম্পূর্ণ জমিন একরঙা হলুদ সিল্ক, তসর, মুগা অথবা ইরি দিয়ে ঘন ফোঁড় দেওয়া হতো। এসব কাঁথার অনেকগুলিই শিকারের দৃশ্য, ইউরোপীয় মানব অবয়ব এবং মাছসহ সামুদ্রিক দৃশ্যাবলী, জাহাজ এবং মৎস্যকুমারী দিয়ে নকশি করা হয়েছে। কিছু দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে পর্তুগিজ সৈন্যরা পানরত অথবা অন্যান্য ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত। কখনও কখনও ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর গল্পের দৃশ্যসমূহ কাঁথার কাজে বর্ণনা করা হয়, যেমন সোলায়মানের বিচারের গল্প অথবা গ্রিক এবং রোমান পৌরাণিক কাহিনীসমূহ, ভারতীয় বিষয়বস্তু যেমন বিষ্ণু তার মৎস্য অবতারে মনুর পোতকে পথ প্রদর্শন করছে।

হুগলি নদীর উপনদী সরস্বতীর তীরে সাতগাঁও অবস্থিত। সরস্বতী ক্রমে ভরাট হয়ে যাওয়ায় ১৫৩৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে এ স্থানের গুরুত্ব কমে যায় এবং ব্যবসা বাণিজ্য হুগলি বন্দরের দিকে স্থানান্তরিত হয়। ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মুগল সৈন্যরা হুগলি দখল করে এবং সেখানে পর্তুগিজ সার্বভৌমত্ব অবলুপ্ত হয়। আরউইন এবং হল বলেন, স্থানীয় সাতগাঁও নকশি কাঁথা পর্তুগিজ সার্বভৌমত্বের অবসানের পরও অনেকদিন টিকে ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, সে সময় থেকে এ ব্যাপারে বাংলার বাণিজ্য বার্ষিকীতে কখনও কোন উল্লেখ করা হয় নি। যদিও এ প্রভাব মাত্র এক শতাব্দী টিকে ছিল, এটা সন্দেহাতীতভাবে কাঁথার নকশি কাজের উপর প্রতিফলিত হয়েছিল। যশোর, ফরিদপুর অঞ্চলের নকশি কাঁথায় শুধু ভারতীয়-পর্তুগিজ কাঁথার দৃশ্যের প্রাচুর্যই দেখা যায় না, এর বর্ণনামূলক গুণটাও সেগুলিতে খুঁজে পাওয়া যায়।

যদিও দেশী কাঁথায় চেন সেলাই না করে কাঁথা ফোঁড় করা হয়েছে এবং ভারতীয়-পর্তুগিজ কাঁথার মতো এগুলি ততটা ভারি করে নকশা করা হয় নি, তবুও কোন কোন কাঁথার দৃশ্যাবলী ও মোটিফ ভারতীয় পর্তুগিজ কাঁথার কথা মনে করিয়ে দেয়, বিশেষ করে শিকারের দৃশ্যাবলী, সৈনিকদের দৃশ্যাবলী এবং মাছ ও নৌকার মোটিফগুলো। অধিকন্তু, যেভাবে নকশি কাঁথা প্যানেলে বিভাজন করা হয় তাও ভারতীয়-পর্তুগিজ কাঁথার কাঁথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আরউইন মন্তব্য করেন- "অবয়বমূলক রচনাগুলি স্বনির্ভর বর্ণনামূলক প্যানেলে করা হয়, প্রায়শ যুক্তি অনুক্রম ব্যতিরেকে, তথাপি এগুলি বিন্যস্ত হয়েছে খুব দৃঢ় প্রতিসম পরিকল্পনার মধ্যে।" এ অংশে বিভক্তিকরণ খুব পরিশীলিত কিছু নকশি কাঁথার অনুরূপ, বিশেষ করে যেগুলি যশোর ও ফরিদপুরে তৈরি। কাঁথার ভিতরে অন্যান্য প্রভাবও দেখা দেয়। ব্রিটিশদের নির্দেশে করা হয়েছিল সাদাতে সাদা কাজ করা বিছানার চাদর, যার কিছু নিদর্শন বিলাতের ভিক্টোরিয়া এন্ড এলবার্ট যাদুঘরে রক্ষিত আছে। রাজশাহী অঞ্চলে উপরিভাগে নতুন লালসালু এবং নিচের স্তরে নতুন সাদা কাপড় দিয়ে তৈরি কাঁথা এ বিলাতি কাথার হুবহু নকল। এ কাঁথাগুলিকে সুজনী বলা হয়। শব্দটি ফার্সি সজনী শব্দের রূপান্তর" (সূচ দিয়ে কাজ করা; সূচিকর্ম) এবং বিহার ও পশ্চিম বাংলায় এ শব্দটি কাঁথা বুঝাতে ব্যবহার করা হয়। কাঁথার পাশাপাশি এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। উন্নতমানের বিছানার চাদর বুঝাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ এলাকার রাজা রামপুর গ্রামের নারীরা সুজনীকে বিলেতী সুজনী বা ইংলিশ সুজনী বলে থাকে, যা এর ব্রিটিশ উৎসের সপক্ষেই ইঙ্গিত দেয়।

কাঁথা ফোঁড়ের বদলে এ কাঁথা নকশার কাজে বখেয়া ফোঁড় ব্যবহার তৈরী হয়। [জামান : ২০০৭: ৫৪৮]।

ইতিহাসের প্রথম যুগ থেকে সমাজের সাংস্কৃতিক ধারাকে নীরবে গৃহকোণে, নিজের কর্মধারার মধ্যে বাঁচিয়ে রেখেছেন নারী। এ সত্য বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শিল্পকলার ধারা অনুসন্ধানীরা আবিষ্কার করেছেন, সমাজতত্ত্ব অনুশীলনের মাধ্যমে। আবহমান বাংলার ঐতিহ্যে লোকশিল্প এক অনন্য উপাদান। এ শিল্পটি দেশীয় উপাদান দিয়ে হাতের তৈরি গ্রামের মানুষের মনের মাধুরী মিশিয়ে বংশ-পরম্পরায় যুগের পর যুগ ঐতিহ্য বহন করে থাকে। বাংলার লোকসমাজে নারীরা বেরসিক নয়, তারা সমাজের সঠিক আবেগ ও নান্দনিক উপলব্ধির প্রতিফলন ঘটায় লোকশিল্পে। পাহাড়ের বুক থেকে খসে পড়া উপলখণ্ড যেমন তার দীর্ঘ চলার পথে অবিরত বর্ষণের ফলে নিটোল নুড়িরূপ ধারণ করে সমুদ্রের বালুকা বেলায় উপনীত, তেমনি লোকসমাজের তৈরি লোকশিল্পের আঙ্গিক ও আদল বারোজনের রস সৃষ্টির স্পর্শে হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের ঐতিহ্যের সাথে বাংলার লোকশিল্প ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। আমাদের বাংলাদেশ **১৯৭১** সালের **১৬** ডিসেম্বরে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র জন্ম হওয়ার অনেক আগ থেকেই বাঙালিরা বিশেষকরে নারীরা তাদের নান্দনিক সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে লোক-প্রযুক্তির ব্যবহার করে যুগের পর যুগ বিভিন্ন ধরনের লোকশিল্প তৈরি করে আসছেন। [কর্মকার : ২০১৪: ১৬৮]

বাংলাদেশের সামাজিক-সাংস্কৃতিক রূপ, পদ্ধতি এদেশের গ্রামভিত্তিক প্রকৃতিনির্ভর পরিবেশ ও প্রতিবেশকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ফলে বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবেশ, জীবনধারা এদেশের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের উপর প্রভাব প্রয়োগ করেছে। এদেশের প্রকৃতি কার্পাস তুলা, সুতি বস্ত্রের জোগান দিয়েছে। সেই সূত্রে পুরানো কাপড় দিয়ে নকশি কাঁথা সৃষ্টি করেছে লোক সমাজের মেয়েরা। প্রাচীনকাল থেকে এদেশের মেয়েদের তৈরি নকশি কাঁথা বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদান-লোক ও কারুশিল্প হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। প্রকৃতি, পরিবেশে গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবন যাপনে উপযোগিতার প্রেক্ষিতে এদেশের মেয়েদের অনুভব ও চেতনা নকশি কাঁথায় বিধৃত হয়েছে। [আলম: ২০১০: ৭৩-৭৪]।

নকশি কাঁথাকে দুটো বিষয়ে ভেদরেখা টানতে পারি, অঞ্চলভেদে এবং ব্যবহারভেদে। আদিবাসী এলাকা ব্যতীত বাংলাদেশের সর্বত্র কাঁথা তৈরি করা হয়, কারণ ঐতিহ্যবাহী আদীবাসী কাপড় কাঁথা তৈরিতে ব্যবহারের জন্য বেশি মোটা। তবে সর্বোৎকৃষ্ট কাঁথা তৈরি করা হয় মেঘনার পশ্চিম অঞ্চলে। এ অঞ্চলটি প্রাকৃতিকভাবে পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং মেঘনা নদী দ্বারা তিনটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বিভক্ত, যা তিনটি কাঁথা প্রস্তুতকারী অঞ্চলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। অঞ্চলগুলো হল ব্রহ্মপুত্র-যমুনা এবং মেঘনার মধ্যবর্তী এলাকায় জামালপুর-ময়মনসিংহ অঞ্চল, পদ্মা এবং ব্রহ্মপুত্র-যমুনার মধ্যবর্তী রাজশাহী এলাকায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চল এবং পদ্মা ও মেঘনার মধ্যবর্তী যশোর-ফরিদপুর অঞ্চল।

যশোর-ফরিদপুর অঞ্চল থেকে আসে সর্বোত্কৃষ্ট নকশি কাঁথা। রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ অঞ্চল থেকে আসে সবচেয়ে পুরু কাঁথা, যার মধ্যে আছে লহরী কাঁথা যা সম্পূর্ণটাই নকশা করা হয় শাড়ির পাড়ের সুতার পরিবর্তে সাধারণ সুতা দিয়ে। এ এলাকা থেকে আরও আসে সুজনী- নতুন লালসালু দিয়ে তৈরি কাঁথা যার উপরিভাগে সাদা সুতা দিয়ে বখেয়া ফোঁড়ের নকশা করা থাকে-এবং কার্পেট অথবা ক্রসসেলাই কাঁথা। 'গ্রামীণ' ধরনের কাঁথা আসে জামালপুর-ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে যেখানে আজ গড়ে উঠেছে সূক্ষ্ম ফোঁড়ে কাজ করা পাড়সমৃদ্ধ কাঁথার গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন কেন্দ্র। [জামান: ২০০৭ : ৫৪৬]

বস্তুজাত সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট বস্তু, জিনিসের মৌলিক আকার, গড়ন সময়ের ব্যবধানে সৌন্দর্যের, রূপের, রঙের, নকশার, সুষমার লোক ও কারুশিল্পে পরিণত হয়ে থাকে। কারুশিল্পী কালিক ও স্থানিক

ব্যবধানে লোক সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনধারার প্রেক্ষিতে রূপান্তরের মাধ্যমে লোক ও কারুশিল্পকে চলমান রাখেন। ফলে লোক ও কারুশিল্প-নকশি কাঁথা উপযোগিতার ও সৌন্দর্যের, লৌকিক আচার আচরণের এবং প্রতিনিয়ত নকশি কাঁথা সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সংস্কৃতির বহুমাত্রিকতার গুণ ও বৈশিষ্ট্য একে চলমান, অব্যাহত রেখেছে। তবে স্থানিক ও কালিক ব্যবধান নকশি কাঁথার গুণে, বৈশিষ্ট্যে, রূপে ও সৌন্দর্যে রূপান্তর ঘটছে। রূপান্তরের ধারা নানা পর্যায়ে সনাক্ত করা যায়। সময়, কালের ব্যবধানে লোকজীবন ধারার রূপান্তরের মতই নকশি কাঁথার রূপান্তর প্রক্রিয়া চলে নানা পর্যায়ে এবং নকশি কাঁথার রূপান্তর প্রক্রিয়া চলেছে নিম্নলিখিত পর্যায়ে। (ক) উপকরণ, কলাকৌশল, (খ) উপযোগিতা, (গ) নকশি কাঁথায় মোটিফের ব্যবহার, (ঘ) শৈল্পিক, (ঙ) বাণিজ্যিক। [আলম : ২০১০: ৭৬]

কাঁথা তৈরির প্রথম উপকরণ হল মেয়েদের পরনের পুরনো শাড়ি কিংবা পুরুষদের পরনের পুরনো ধুতি। কাঁথার ঘনত্বের জন্য পাঁচ থেকে সাতটা পুরো শাড়ি বা ধুতির প্রয়োজন হয়। অনেকগুলি কাপড় সমানভাবে একসঙ্গে ভাঁজ করে নিয়ে তাদের চারপাশ খেজুরপাতার কাঁটা দিয়ে আটকে দিতে হয়। এর পর বড় বড় টাক সেলাই দিয়ে খেজুর কাঁটাগুলি খুলে ফেলতে হয়। পরিশেষে কাপড়ের ওপরের দিকে বিভিন্ন ফোঁড় দিয়ে নানা নকশা তোলা হয়। এই সহজলভ্য পরিত্যাজ্য পুরনো কাপড়কে কাঁথা তৈরির কাঁচামাল বলা যায়।

দ্বিতীয় উপকরণ হল, খেজুরপাতার কাঁটা বা বাবলা কাঁটা। এই কাঁটা দিয়ে ভাঁজ করা কাপড়গুলির চারপাশে আটকে দিতে হয়, যাতে কাপড় সরে না যায়। তৃতীয় উপকরণ হল ঘটি। কাঁথার ভাঁজ বা পাট করা কাপড়টিকে সমান রাখার জন্য একটা বড় ঘটিকে (তলাটা চ্যাপটা ধরনের) কাঠকয়লার অল্প আঁচে বসিয়ে রেখে গরম করে সেটিকে ভাঁজ করা কাপড়টির ওপর দিয়ে ইস্ত্রি করার মতো চেপে দিতে হয়, কিংবা জলভর্তি ঘটি (বর্তমানে ইস্ত্রি) চেপে দিতে হয়, যাতে কাপড়টি কুঁচকে না থাকে, বা কাপড়টিতে ভাঁজ না পড়ে। চতুর্থ উপকরণ হল এক টুকরো কাঠকয়লা বা কোনও গাছের রস থেকে সংগৃহীত রং বা পেন্সিল, যার সাহায্যে কাঁথার বর্ডার ও নকশা আঁকা হয়।

পঞ্চম উপকরণ সুচ ও সুতো। সুচে সাদা ও রঙিন সুতো পরিয়ে কাপড়ের আঁকা নকশার ওপর নানা ফোঁড় তোলা হয়। সেলাইয়ের জন্য যে সুতোর ব্যবহার করা হয় তা পুরনো কাপড়ের পাড় থেকে বের করে হাতের চার আঙুলে পেঁচিয়ে অথবা সুতোর রিলে জড়িয়ে রাখা হয়। হাঁটু মেলে বসে পায়ের বুড়ো আঙুলে সুতো জড়িয়ে দুহাতে মেয়েরা সুতোর প্যাচ দেন। এইভাবে নানা রঙের সুতোকে হাতের চার আঙুল একত্র করে পেঁচিয়ে রাখেন মেয়েরা। বেশিরভাগ কাঁথাতে লাল, কালো, হলুদ, নীল, খয়েরি সুতোর ব্যবহার দেখা যায়। তবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় সাদা সুতোর। এ ছাড়া গোলাপি ও ছাই রঙের সুতোরও ব্যবহার দেখা যায়। এইসব নানা রঙের সুতো দিয়ে বিবিধ নকশা তুলে তৈরি হয় একটি চমৎকার কাঁথা। কাঁথার প্রত্যেকটি ফোড়ের মধ্যে ধরা পড়ে শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্যের অপূর্ব কুশলতা। কাঁথায় ফোঁড় ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল– প্রথমত, এগুলি দেখতে সুন্দর। দ্বিতীয়ত, স্তরে স্তরে সাজানো পুরনো কাপড়গুলিকে বিভিন্ন ধরনের ফোঁড় দিয়ে মজবুত ও টেকসই করে তোলা। তৃতীয়ত, কাঁথায় ব্যবহৃত নকশাগুলি বিভিন্ন ফোড়ের সাহায্যে সুস্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা। তাই কাঁথা সেলাই করা শেষ হয়ে গেলে দৃষ্টিনন্দনকারী নকশি কাঁথাকে দেখায় একখানি মনোরম বর্ণাঢ্য ছবির মতো। [বসাক: ২০০২: ১৯]।

পুরানো নকশি কাঁথা তৈরিতে সাধারণত পুরানো শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি ব্যবহার করা হয়েছে। পুরানো নকশি কাঁথার উপকরণ দেখলে তারই প্রমাণ মেলে। পুরানো শাড়ির পাড় থেকে তোলা সাদা ও রঙিন সুতা পুরানো নকশি কাঁথায় ব্যবহৃত হত। কখনো কখনো কিছু নতুন সুতাও ব্যবহৃত হয়। পুরানো কাঁথাগুলোতে (একশ বছরের) সাদা, কালো, নীল, লাল এই চার রঙের সুতা অধিক মাত্রায় ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তী সময়ের কাঁথাগুলোতে অর্থাৎ ১৯৫০ পর্যন্ত সময়ের

কাঁথায় এরও অতিরিক্ত রঙের সুতা ব্যবহার করা হয়েছে যেমন, হলুদ, কমলা, সবুজ, খয়েরি, বেগুনী। আরো পরের কাঁথায় অর্থাৎ বর্তমান সময় পর্যন্ত নকশি কাঁথায় সুতা ব্যবহারে ব্যাপক পরিবর্তন সূচীত হয়েছে। নকশি কাঁথায় পুরানো শাড়ির পাড়ের সুতার বদলে নতুন সুতা ব্যবহার হয়েছে, সেই সঙ্গে রেশমি এমব্রয়ডারী সুতা, এমনকি রঙিন চিকন উলও নকশি কাঁথায় সুতা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অতি সম্প্রতি স্বাধীনতা উত্তর কাল থেকে বিশেষ করে ১৯৮০ সালের পর থেকে এদেশে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন নারী সমিতির মাধ্যমে বাণিজ্যিক নকশি কাঁথা তৈরি করাচ্ছে। সেসব কাঁথায় নতুন কাপড় ধুয়ে নতুন রঙিন সুতার পাশাপাশি জমিনে চিত্রগুণ ও ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধিতে কাঁথা সেলাই কাজে বিদেশী এমব্রয়ডারী রেশমী রঙিন সুতা সরবরাহ করে এবং উদ্যোগী সংস্থার ফরমায়েসে নকশি কাঁথা মেয়েরা তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য তৈরি করে। [আলম: ২০১০ : ৭৭]

কাঁথা সেলাই করবার সময়ে নানারকম ফোঁড় দেওয়া হয়। কাঁথা সেলাইতে ফোড়ই প্রধান। সাধারণত কাঁথা সেই রাতে কয়েকটি বিশেষ ফোঁড়ের ব্যবহার করা হয়। এই ফোঁড়গুলি হল রান ফোঁড়, ডবল রান ফোঁড়, তেরছা ফোঁড়, বখেরা বা বখেয়া ফোঁড়, বাঁশপাতা ফোঁড়, বেঁকি ফোঁড়, লিক ফোঁড়, বরফি ফোঁড়, চাটাই বা পাটি ফোঁড়, বোতামঘর, তোলা ফোঁড়, কুচি বা পেটে ফোঁড়, ভরাটু ফোঁড়, ক্রস ফোঁড়, গাঁট ফোঁড়, প্যাচ ফোঁড়, ভাল ফোঁড়, চেন, কর্ষিদা, হেরিংবোন, ডবল হেরিংবোন ইত্যাদি। কাঁথায় রান ফোঁড় দিয়েই বেশি সেলাই করা হয়। তবে ভরাট ফোঁড়ও দেওয়া হয়। যেমন ঝুর পিঁপড়ি ভরাট সাধারণত ফুলে দেওয়া হয়। মুক্তাগাছায় (ময়মনসিংহ) কাঁথার ফোঁড়ের স্থানীয় নাম চারি বাইট্টা, মাছি বাইট্টা, জিঞ্জির বাইট্টা। মূল কাঁথাতে ছোট ছোট রানকে গুড়ি রান বলে। আবার কোনও কোনও অঞ্চলে গুড়ি রানকে জিরে রানও বলা হয়। যশোরের কালীগঞ্জে সুজনি কাঁথাকে পাডন কাঁথা বলা হয়। এখানে ক্রস ফোঁড়ের কাঁথার স্থানীয় নাম 'তারা ফোড়া' এবং কাঁথার ফোড়গুলির মধ্যে সাদা ফোঁড় বা কুচান ধাগা, বকিয়া বা ডাল ফোঁড় নামও প্রচলিত। আবার যশোরের শৈলকুপায় কাঁথার ফোড়গুলির নাম ভিন্ন ধরনের, যেমন-তারা ফোঁড়কে সাদা ও কুচি ফোঁড়, ক্রস ফোঁড়কে তারা ফোঁড়, চেন ফোঁড়কে 'বিলাইহোতা' বলা হয়। যশোরের আত্রাই-তে ক্রস ফোঁড় ও তারা ফোঁড়ে বিভিন্ন নকশা তুলে বালিশের ঢাকনা কাঁথা বা বেটনের বহুল প্রচলন দেখা যায়। এখানে প্রচলিত নকশাগুলির নাম-বিস্কুট, তাস, তেঁতুলপাতা, কৃষ্ণচূড়া, আয়নাখোপী। এই নকশাগুলি বিভিন্ন ফোঁড়ের সাহায্যে তোলা হয়। এখানে বুগলি বা থলি বা বটুয়া 'শিবঝুলি' নামে পরিচিত। রাজশাহির চাঁপাইনবাবগঞ্জে (বর্তমানে নবাবগঞ্জ) প্রচলিত চার রকমের কাঁথায় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। কাঁথাগুলি হল লহরি, লিক, সুজনি বা বেলায়েতি এবং কার্পেটি। তৈরি ফোঁড় এবং বড় বড় লিক ফোঁড়ে লহরি কাঁথা এবং কার্পেটি কাঁথা ক্রস ফোঁড়ে সেলাই করা হয়। সুজনিকে বলা হয় 'এক ফোঁইড়া'। এখানে আর একধরনের 'ছোপটানা' কাঁথার ব্যবহার দেখা যায়। এই কাঁথাটিতে সোজা ফোঁড়ে লম্বালম্বি কয়েকটি ডোরা সেলাই দেওয়া হয়। প্রত্যেক ধরনের কাঁথা নির্দিষ্ট ফোঁড়ে আগাগোড়া সেলাই করা হয়, কখনও একাধিক ফোঁড়ের সংমিশ্রণ হয় না। এখানকার কাঁথা লাল শালুর জমিনে করা হয়। এ ছাড়া এখানে বার কোইনা লহরি, চারচালা লহরি, ডালাফুল লিক নামেও কাঁথার প্রচলন রয়েছে। [বসাক, শীলা : ২০০২: ১৯-২০]।

রান ফোঁড় : রান সেলাই কাঁথার প্রধান ফোঁড় এবং কাঁথায় সবচেয়ে বেশি এই ফোঁড়ের ব্যবহার করা হয়। কাপড়ে সুচ একটু ঢুকিয়ে একটু কাপড় ছেড়ে নীচ থেকে ওপরে তুলে এই ফোঁড় করা হয়। এই ফোঁড়ে কাঁথার মোটিফ তোলা হয় বিভিন্ন ভাবে, অর্থাৎ ছোট-বড় বা ঘন-ফাঁক করে দেওয়া হয়। যখন কুচি বা গুড়ি বা জিরে রান করা হয় তখন সাদার মধ্যে সাদা সুতো দিয়ে খুব ছোট ছোট রান সেলাই করতে হয়। ডিজাইন অনুসারে রান সেলাই ঢেউ খেলানো, লম্বালম্বি, কোনাকুনি, আড়াআড়ি, গোল বা ত্রিভুজ বা চৌকোভাবে দেওয়া যেতে পারে।

ডবল রান ফোঁড় : প্রথমে একবার রান সেলাই করার পর ফাঁকগুলিতে আবার পরপর রান ফোঁড় দেওয়াকে ডবল রান ফোঁড় বলা হয়। এই ফোঁড়ে ভরাট ঘন হয় বলে দেখতে খুব সুন্দর হয়। কোনও কোনও অঞ্চলে একে ডুরে রান বলে। একে আবার সমান তোলাও বলে।

ডারনিং ফোঁড় : প্রথমে দুটি লাইনেই রান ফোঁড় দেওয়া হয় এবং দ্বিতীয় লাইনের ফোঁড় প্রথম লাইনের ফাঁকের মধ্যে দিতে হয়, অর্থাৎ একটা বাদ দিয়ে করতে হয়। এর পর সম্পূর্ণ অংশটা রিফুর মতো ছোট ছোট রান দিয়ে ভরাটের মতো করা হয়। এই ফোঁড় দিয়ে বিভিন্ন ডিজাইন করা হয়। চাটাই বা পাটি ডিজাইনের ক্ষেত্রে ডারনিং ফোঁড় সমান্তরালভাবে খুব ঘন ঘন দিতে হয়। কাঁথার বিভিন্ন মোটিফ, পাতা, ফুল, চক্র, কলকা ইত্যাদি এই ফোঁড়ের সাহায্যে ভরাট করা হয়। রাজশাহি অঞ্চলের কাঁথার লহরি ডিজাইনে এই ফোঁড় ব্যবহৃত হয়।

বেঁকি ফোঁড় : এটি রান ফোঁড়, তবে ছোট-বড় করে রান সেলাই দিতে হয়। এটি করতে হয় বর্ডার বা বিভিন্ন মোটিফ সামান্য ফাঁক রেখে ছোট-বড় রান সেলাই দিয়ে। অর্থাৎ ছোট থেকে বড় কিংবা বড় থেকে ছোট রান সেলাই দিতে হয় সমান্তরালভাবে, যা দেখতে বাঁকা মতো হয়। একে চাটাই ফোঁড়ও বলা হয়। কারণ, এই ফোঁড় চাটাইয়ের ডিজাইনের মতো দেখতে। এই ফোঁড়ের সাহায্যে পাতা, চালতাফুল, ঘূর্ণি বা চরকি, ধানের ছড়ি ইত্যাদি ডিজাইন করা হয়। একে আবার সাইড তোলাও বলা হয়। ধানের ছড়িতে এক ঢালা বেঁকি ফোঁড় দেওয়া হয়।

বখেয়া ফোঁড় ; ব্যাক বা বখেয়া ফোঁড় হল কাপড়ে সুচ ঢুকিয়ে পাশে তুলে আবার পিছন দিক থেকে প্রথম ফোঁড়ের মাথায় সুচ গলিয়ে নীচে দিয়ে আবার তুলতে হয় সমান দূরত্বে। একই লাইনে পরপর করতে হয়।

ক্রস ফোঁড : এই ফোঁড়টি দুটি বিপরীতমুখী কোণের সমন্বয়ে সেলাই করা হয়, যেটি পরস্পরকে মধ্যবিন্দুতে ছেদ করে। কার্পেট, সেলুলা বা চটজাতীয় কাপড়ে কিংবা যে কাপড়ে খোপ খোপ অংশ থাকে, সে ধরনের কাপড়ের ওপর এই ফোঁড় করা হয়। তবে রাজশাহির কাঁথায় এই ফোঁড়ের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। রাজশাহিতে এটিকে কার্পেট ডিজাইন বলা হয়।

বোতামঘর ফোঁড় : কাপড়ে সুচ বিঁধিয়ে তুলে নিয়ে সুচের মাথার ওপর দিয়ে সুতোটা দিয়ে এই ফোঁড় সমান দূরত্বে করা হয়। সাধারণত কাঁথায় এই ফোঁড়ের ব্যবহার কম হয়। তবে কোনও কোনও মোটিফের ক্ষেত্রে এবং বর্ডারের চারপাশে এই ফোঁড় ব্যবহৃত হয়।

ডাল ফোঁড় : কাঁথায় অনেক সময়ে আউটলাইনের জন্য কিংবা ডিজাইন খুব স্পষ্ট করে দেখানোর জন্য ডাল ফোঁড়ের ব্যবহার করা হয়। সুচটাকে নীচ থেকে ওপরে তুলে আবার আগের ফোঁড়ের পাশের একটু অংশ থেকে সামান্য বাঁকাভাবে সুচ তুলে আনতে হয়। অর্থাৎ পেছনে করতে হয়। সাধারণত গাছের ডাল, পাতার শির, লতা ইত্যাদি নকশা সেলাই করতে এই ফোঁড়ের ব্যবহার হয় বলে একে ডাল ফোঁড় বলা হয়।

চেন ফোঁড় : কোনও কোনও কাঁথায় এই ফোঁড়ের ব্যবহার দেখা যায়। এটি দেখতে সুন্দর বলে কেউ কেউ এই ফোঁড় ব্যবহার করে থাকেন। সুচ নীচ থেকে ওপরে তুলে সুতোটা সুচের মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে টেনে তুলে আবার সুচকে আগের ফোঁড়ের মাথায় ঢুকিয়ে টেনে তুলে করা হয়। দেখতে চেনের মতো হয় বলে একে চেন ফোঁড় বলা হয়। এই ফোঁড়ের সাহায্যে নানারকমের ফুল, লতা-পাতা ইত্যাদি নকশা করা হয়।

ভরাট ফোঁড় : ভরাট ফোঁড় কোনও আলাদা ফোঁড় নয়। বিভিন্ন ফোঁড় দিয়ে কাঁথায় বিভিন্ন মোটিফ, ফুল, পাতা ইত্যাদি ভরাট করা হয়। যেহেতু ভরাটের কাজ করে, তাই একে ভরাট ফোঁড় বলা হয়। বিভিন্ন মোটিফ বা ডিজাইন ভরাট ফোঁড়ে করা হয়। ভরাট ফোঁড় দু'রকমের একটা হল দু' দিকেই সমানভাবে ভরাট হয়, আর একটা শুধু ওপরে ভরাট হয়, নীচে হয় না। ওপরে সুতো খুব ঘন ঘন করে নীচ থেকে তুলে সুতোটাকে বাঁ দিকে রেখে এই ফোঁড় করা হয়, অনেকটা কাশ্মীরি ফোঁড়ে মতো।

ফুলের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে ঝুর পিঁপড়ি ভরাট দেওয়া হয়। জামালপুর, শেরপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, রাজশাহি ও মানিকগঞ্জের কাঁথার ভরাট সব আলাদা।

হলবিন ফোঁড় : জ্যামিতিক নকশার সূচিকর্মে হলবিন ফোঁড়ের ব্যবহার করা হয়, মাঝে মাঝে এটি ক্রস ফোঁড় সহযোগেও করা হয়। বাংলার কাঁথাতে জ্যামিতিক নকশার ক্ষেত্রে অনেক সময় এই ফোঁড়ের ব্যবহার করা হয়।

সাটিন ফোঁড় : সাটিন ফোঁড় কাঁথার নকশায় ভরাটের কাজ করে। এই ফোঁড় ছোট-বড় করে কাপড়ে সুচ ঢুকিয়ে ওপরে তুলে, আবার ওই একই ভাবে ঘন ঘন করে তুলতে হয়, অর্থাৎ যে-কোনও নকশার এক প্রান্তের কোনও বিন্দু থেকে ফোঁড় তুলে অপর প্রান্তে সুচ ঢুকিয়ে আবার আগের প্রান্তের বিন্দুর সামান্য পাশ ঘেঁষে সুচটি তুলে আনতে হয়। নকশা যদি বড় হয় তবে নকশাটির মধ্যে ভাগ করে এই ফোঁড় তুলতে হয়। এই সেলাইয়ের বৈশিষ্ট্য হল, এর দুদিকেই সমান হয় অর্থাৎ একই রকম দেখতে হয়। এটি দেখতে খুব সুন্দর হয় এবং ভরাটও খুব ঠাসা হয়। কাঁথার বিভিন্ন মোটিফ বা ডিজাইনের ক্ষেত্রে এই ফোঁড়ের ব্যবহার দেখা যায়।

হেরিংবোন ফোঁড় : কাপড়ে সুচ ঢুকিয়ে কোনাকুনিভাবে ওপরে তুলে তার পাশে সুচ ঢুকিয়ে আবার কোনাকুনিভাবে ডান দিকে নীচে শুরুর একটু পরে সুচ তুলতে হবে এটি বাঁকা ফোঁড়ের মতো দেখতে। হেরিংবোনের পেছনটাই শেডওয়ার্ক ; আবার শেডওয়ার্ক সোজাদিকে করলে উলটোদিক হেরিংবোন ফোঁড়ের ডিজাইন হবে। হেরিংবোন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় ফোঁড়।

ডবল হেরিংবোন ফোঁড় : প্রথমে একটা লাইন একরকম সুতো দিয়ে হেরিংবোন করতে হবে। এর পর অন্য একটা সুতো দিয়ে হেরিংবোন ফোঁড় তুলতে হবে-এতে ফোঁড়গুলি একত্রে জড়িয়ে থাকলেও মাঝে একটু করে ফাঁক থাকে।

লিক ফোঁড় : লিক ফোঁড় রাজশাহি অঞ্চলের কাঁথায় লক্ষ করা যায়। লাল শালুর ওপর লাল বাদে অন্য যে- কোনও রঙের সুতো দিয়ে এই ফোঁড় করা হয়। লাল শালুতে অন্য রঙের সুতো দিয়ে এই ফোঁড় করায় নকশা বেশ উজ্জ্বল ও মোটা দেখায়। এই ফোঁড়ে প্রথমে বেশ কয়েক লাইন রান সেলাই করতে হয় এবং একটা রানের থেকে আর একটা রানের মধ্যে এবং পরপর লাইনের মাঝে বেশ কিছুটা সমান্তরালভাবে ছাড় থাকে। এই ফোঁড়ের সাহায্যে রাজশাহির কাঁথায় আনারসী ও ঘরহাসিয়া নকশা তোলা হয়। এটি ডান দিক থেকে শুরু করে বাঁ দিকে রান সেলাই করে যেতে হয়। প্রয়োজনমতো রান সেলাই করার পর শেষে বাঁ দিক থেকে ডান দিকে এসে যোগ করা হয়। বাগেরহাটে লিক ফোঁড়ের নাম বরিশালী।

জালি ফোঁড়: কাঁথায় জালি ফোঁড়ের ব্যবহার দেখা যায়। এই ফোঁড়ের বৈশিষ্ট্য হল, সুচটাকে কাপড়ে ঢুকিয়ে ওপরে তুলে নিয়ে আবার ওপরদিকে ফোঁড়ের গোড়া থেকে তুলে ফোঁড়ের শেষটায় তোলা। নীচটা দেখতে দুটো ভি (VV)-র মতো হয়, আর ওপরটা হয় জালির মতো।

চাটাই কিংবা পাটি ফোঁড় : এই ফোঁড়ের সাহায্যে ফুল, পাতা, কলকা, চক্র, বেলপাতা এবং বিভিন্ন মোটিফ করা হয়। এই ফোঁড়ে খুব ঘন ঘন এবং সমদূরত্বে রান সেলাই দিতে হয়। দেখতে অনেকটা ডারনিং ফোঁড়ের মতো হলেও এটি অন্যভাবে করা হয়। প্রথমে তিন-চার লাইন রান সেলাই করার পর পরের লাইনে আগের লাইনের ফাঁক অংশে রান ফোঁড় দিতে হয়। রাজশাহির লহরি নকশার কাঁথায় এই ফোঁড় লক্ষ করা যায়।

দোরোখা ফোঁড় : দোরোখা সেলাই কাঁথায় এক চমৎকার চিত্রণের কাজ করে। এর দু'দিকেই সমান। উলটো পিঠ দেখলে মনেই হয় না যে, এটি কাঁথার সোজাপিঠের অপরদিক। তবে এই ধরনের কাঁথা খুব কম দেখা যায়। এই কাঁথার বৈশিষ্ট্য হল, এক পিঠের নকশাগুলি অন্যপিঠে ফুটিয়ে তোলা। কাঁথাশিল্পীর নৈপুণ্যে এক পিঠের নকশাগুলির রং এবং রেখা এমন অবিকলভাবে অপর পিঠেও ফুটে ওঠে যে, কোন পিঠ সোজা আর কোন্ পিঠ উলটো তা বোঝা অত্যন্ত দুষ্কর হয়ে পড়ে। এই ধরনের

কাঁথায় কলকা বা ফুল বা কোনও ফিগারের লম্বা লাইন সাধারণত লক্ষ করা যায়। কাঁথার সূচিকর্মের আর-একটি বিশেষত্ব হল, কাঁথাতে পুরনো কাপড়ের টুকরোগুলি অতি সূক্ষ্ম সেলাই বা ফোঁড়ের সাহায্যে একটির সঙ্গে আর-একটিকে এমন জুড়ে দেওয়া হয় যে, বিশেষভাবে লক্ষ না করলে জোড়গুলি ধরতে পারা যায় না। এই ধরনের কাঁথাতে বঙ্গনারীর তুলনাহীন শিল্পকৌশল বা অসাধারণ দক্ষতা ও কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। [বসাক : ২০০২ : ২২-২৪]।

গ্রামীণ কাঁথা শিল্পীরা গৃহে ব্যবহার বা প্রিয়জনকে উপহার দেবার জন্য বিভিন্ন আকারের কথা তৈরি করেন। 'বাংলাদেশের নানা অংশে দৃশ্যমান নানা ধরনের গার্হস্থ্য ব্যবহারের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ নারীর কল্পনাপ্রবণ সৌন্দর্যপ্রিয়তার ছবি ফুটে ওঠে। আঙ্গুলের দক্ষতা এবং জীবনশিল্পের পারদর্শিতার মাধ্যমে বস্ত্র তার চেহারা বদলের মধ্য দিয়ে আরেক নতুন ধরনের নির্মাণে রূপান্তরিত হচ্ছে যা বহুবর্ণময় এবং দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। কৈশোরেই মেয়েরা এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে শুরু করে এবং বাড়ির জন্য এবং আত্মীয় বাড়ির জন্য নকশিকাঁথা তৈরিতে তাদের সময়ের একটা বড় অংশ ব্যয় করে। কাঁথা নির্মাণশৈলী একটা আত্মনিবেদনের মতো প্রক্রিয়া যার পেছনে ক্রিয়াশীল থাকে কাজটির প্রতি গভীর ভালোবাসা। নকশি কাঁথা বাংলার গ্রামীণ লোকজীবনের সাংস্কৃতিক রূপবৈচিত্র্যের সৃজনশীল বিকাশে পরিপূর্ণ। বহুভাবেই নকশি কাঁথা উপয়োগিতার কাজ করে। সাধারণ কাঁথাগুলিরও একটা ব্যবহারিক মূল্য আছে। অনেকে কাঁথার বিভিন্ন ভাগ দেখিয়েছেন, তবে উপযোগিতার দিক থেকে নকশি কাঁথাকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

বাংলাদেশের লোকজীবন ধারার প্রয়োজন, উপযোগিতার নিরিখেই নকশি কাঁথার উদ্ভব এবং অনিবার্যভাবে নকশি কাঁথা এদেশের লোক সংস্কৃতির উপাদানে পরিণত হয়েছে। নকশি কাঁথার ব্যবহারের বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে নাম, বৈশিষ্ট্য নিন্দিষ্ট হয়েছে। নকশি কাঁথা, আসন কাঁথা, লেপ কাঁথা, নকশি থলে, আরশিলতা, বালিশের ঢাকনা, পান-সুপারি রাখার খিচা, ফকিরের ভিক্ষার ঝুলি, সারিন্দা দোতরা রাখার আবরণী, বায়তন বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন ব্যবহার দেখা যায়। আবহমান বাংলার লোকজীবনের সাধারণ মানুষের অনুভব, ভাষা নকশি কাঁথার উল্লিখিত নামকরণ করেছে। অঞ্চল ভেদে প্রতিটি নামেরও ভিন্নতা, বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। উল্লিখিত নামের কাঁথাগুলো প্রাচীন ধারার। [আলম: ২০১০: ৮০-৮১]

উপযোগিতার ভিত্তিতে কয়েক ধরণের নকশিকাঁথার বর্ণনা দেওয়া হলো-

ওয়ার বা বালিশের ঢাকনা: এর ওপরফুল, প্রজাপতি, পাখি ও বৃক্ষের ছবি তৈরি করা হয়। এটি একটি দ্বিস্তর বিশিষ্ট কাপড় যাতে বাড়তি ঝালরের বর্ডার দেয়া হয়। অতিথি এলে বালিশের ওপর দিয়ে বিছিয়ে দেয়া হয়।

আরশিলতা: শিল্পী নিজ ব্যবহারের আয়না, চিরুনী, অলংকার, সিদুরদানী প্রভৃতি রাখার জন্য এটি তৈরি করে। এর ওপর এক জোড়া লাভ বার্ড, পুষ্পিত লতা বা পদ্মফুল, ময়ুর, কদম গাছ, চাকফুল, চাঁদ তারা আঁকা হয়।

বটুয়া বা পার্স, দুর্জনী, খিচা, বগলি, বা নকশি থলি : এর মধ্যে মূল্যবান অলংকার বা টাকা রাখা হয়। এর আকার ছোট ব্যাগের মতো হয় এবং খামের মতো ভাঁজ করে মোটা সুতা বা তারের সাহায্যে আটকে রাখা হয়। এই ধরনের কাঁথা বিভিন্ন ধরনের থলি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি দৈর্ঘ্যে দশ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ছয় ইঞ্চি মাপের হয়। তিনটে কোণকে মধ্যবিন্দুতে এনে ভাঁজ করা হয়, তবে ওপরের ভাঁজটি একটু ছোট ভাঁজ হয়, নীচের কোণের ভাঁজ দুটি বড় ও সমান ভাঁজ হয়ে কেন্দ্রে এসে মেশে। এই ধরনের থলিতে সাধারণত টাকা-পয়সা, পান-সুপারি এবং প্রয়োজনীয় ছোটখাট জিনিস রাখা হয়। একে আবার জপের থলি ও বৈরাগীর ঝোলাও বলা হয়। কারণ এতে জপের হরিনামের মালা বা তসবি রাখা হয়। এটি আকারে খামের মতো বা অনেকটা ছোট বটুয়ার মতো দেখতে। এই ধরনের থলিতে জ্যামিতিক নকশা, চারপাশে বর্ডার, কেন্দ্রে পদ্ম ইত্যাদি নকশা দেওয়া হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের

লতার নকশা, যেমন কানাইলতা, কুমারীলতা, বেরালতা ইত্যাদি। একে আবার বাংলাদেশের নাটোরের চলনবিলে 'খিচা' ও বলা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এটি 'দুজনী' নামে পরিচিত।

গিলাফঃ বটুয়ার বড় সংস্করণ। সাধারণত পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ রাখার জন্য ব্যবহার হয়। এতে সাধারণত ফুলের নকশা বা জ্যামিতিক নকশা আঁকা হয়। এর বুনটে শক্ত সেলাই থাকে যাতে করে এর ধারণ ক্ষমতা সুসংহত হয়। গিলাফ শব্দটি আরবি। এর অর্থ ঢাকনা।

দস্তরখান : খাবার সময় মেঝেতে বিছিয়ে তার ওপর অতিথিদের খাবার পরিবেশন করা হয়। মুসলমানদের বাংলায় আগমনের পর দস্তরখানের প্রচলন শুরু হয়। এগুলো দু'জন থেকে শুরু করে ন'জন মানুষের অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য তৈরি হয়। এতে কোন অংশে খাবারের প্লেট থাকবে তা চিহ্নিত করা থাকে। এর মোটিফগুলো জ্যামিতিক এবং রৈখিক। এতে ফুল এবং সবজির ডিজাইন থাকে। দস্তরখান শব্দটি পারস্য থেকে এসেছে।

ঢাকনি বা বর্তন ঢাকনি : খাবারের ট্রের ঢাকনি। উৎসবকালে হিন্দু মুসলমান সবাই প্রতিবেশীর বাড়িতে যে খাবার পাঠায় তার ট্রের ওপর এই ঢাকনি ব্যবহৃত হয়। এর ওপর ফুল, নৌকা, এবং অন্যান্য গার্হস্থ্য বস্তুর প্রতীকী চিহ্ন আঁকা থাকে।

বোঁচকা বা বাইতনঃ কাপড় বা অন্য মূল্যবান সামগ্রীর ঢাকনা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কোনো কোনো এলাকায় একে বোস্তানীও বলা হয়। সাধারণত তিনস্তর পুরোনো কাপড় দিয়ে তৈরি হয়। শাড়ির পাড়ের মোটিফে সজ্জিত থাকে। পুরো জমিন পদ্ম, জীবনবৃক্ষ, কৃষি জীবনের ছবি, এবং জ্যামিতিক ফর্ম-এ সাজানো থাকে। এগুলো সাধারণত চতুর্ভুজাকৃতি হয় এবং বাঁধার জন্য দড়িযুক্ত থাকে।

পান-প্যাঁচানীঃ পান-সুপারি পেঁচিয়ে (জড়িয়ে রাখার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। এটির ব্যবহার নকশি থলি বা বগলির মতো। এটি দৈর্ঘ্যে ১৫-১৬ ইঞ্চি এবং প্রস্থে আট ইঞ্চি মাপের হয়। এতে পানপাতা, ফুল, বিভিন্ন ধরনের লতার নকশা লক্ষ করা যায়।

রুমাল কাঁথাঃ এই ধরনের কাঁথা দেখতে চৌকো, অর্থাৎ এটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এক ফুট মাপের হয়। ছোট চারকোনা টুকরো কাপড় দিয়ে এই কাঁথা তৈরি হয়। এটি রুমাল হিসেবে ব্যবহৃত হলেও অনেকক্ষেত্রে ডিশ বা প্লেট ঢাকার জন্যও ব্যবহৃত হয়। এটি পাতলা হয়। এই ধরনের কাঁথার কোণে অনেকসময় শিল্পী নিজের নাম এবং যাকে উপহার দেন তার নামও লিখে দেন ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ। এতে প্রজাপতি, পাখি, পদ্ম, গোলাপ, কলকা, লতা-পাতা ও বিভিন্ন ধরনের ফুলের নকশা লক্ষ করা যায়।

মাজার কাঁথাঃ মাজারের ঢাকনা হিসেবে এই কাঁথা ব্যবহৃত হয়। এটি দৈর্ঘ্যে চার-পাঁচ ফুট এবং প্রস্থে তিন-সাড়ে তিন ফুট মাপের হয়। কোনও ফিগার বাদ দিয়ে বিচিত্র ধরনের নকশা এই ধরনের কাঁথায় চিত্রিত করা হয়।

ঢাকনি কাঁথাঃ চেয়ার, টেবিল, বাক্স, ঘোড়ার গদির ওপর আচ্ছাদনের জন্য এই ধরনের কাঁথার ব্যবহার দেখা যায়। এটি আকারে চৌকোর চাইতে কিছুটা বড় মাপের হয়। বর্গাকৃতি এই কাঁথায় জ্যামিতিক চৌকো নকশা বা ফুল, লতা-পাতা, পশু-পাখির মোটিফ বা নকশা করা হয়।

সারিন্দা বা আবরণী কাঁথাঃ বাদ্যযন্ত্র রাখার জন্য ব্যবহৃত হয় আবরণী কাঁথা। আর সারিন্দা বা ওই জাতীয় বাদ্যযন্ত্র রাখার জন্য এই ধরনের ঝোলাকে বলা হয় সারিন্দা কাঁথা। বাদ্যয়েন্ত্রর মাপ অনুযায়ী এই ধরনের কাঁথা তৈরি করা হয়। এতে বাদ্যযন্ত্র বিষংক ওমাটিফের প্রাধান্য লক্ষ করা গেলেও ফুল, লতা-পাতার নকশাও দেখা যায়।

দেওয়ালে ঝোলানো (টাঙানো) কাঁথাঃ সাধারণত এটি ঘর সাজানো হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি আকারে বড়, ছোট এবং লম্বাটে ধরনের হয়। এতে বিভিন্ন ধরনের মোটিফ বা নকশার প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। এই ধরনের কাঁথা ঘরের সৌন্দর্য বর্ধন করে বলে এতে নানা রঙের সুতো

দিয়ে চমৎকার ডিজাইন তোলা হয়, যার মধ্যে দিয়ে পল্লীবালাদের সুচিশিল্পের নিপুণ দক্ষতার পরিচয় ফুটে ওঠে।

পরদা কাঁথাঃ পালকি বা নৌকার ছইতে বা গোরুর গাড়িতে ব্যবহৃত ঢাকনিস্বরূপ পরদা কাঁথার ব্যবহার দেখা যায়। এটি আকারে অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে তিন বা সাড়ে তিন ফুট এবং প্রস্থে আড়াই বা তিন ফুট মাপের হয়। পালকির কাঁথা সম্বন্ধে তোফায়েল আহমদ বলেছেনঃ কুমারখালীতে এর নাম খাটদোলাই। তাছাড়া পালকীর উপরে বিছাবার জন্য পালকীর টোপর কাঁথাও তৈরী হয়। [আহমদ : **১৯৯২:৬২**]। এতে নানা ধরনের ডিজাইনের আধিক্য লক্ষ করা যায়, যেমন- প্রজাপতি, কামরাঙা বা যে-কোনও ফুল, খুন্তিলতা, কলমিলতা, শঙ্খলতা ইত্যাদি।

গেলাপ, চাদর বা শাল কাঁথাঃ এই ধরনের কাঁথা গায়ের শাল বা চাদর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শীতকালে এটির ব্যবহার দেখা যায়। গায়ের আচ্ছাদন হিসেবে এটি দৈর্ঘ্যে পাঁচ বা ছ' ফুট এবং প্রস্থে আড়াই বা তিন ফুট মাপের হয়। এতে বিবিধ নকশার বাহার দেখা যায়। বিশেষত কোণে কলকা এবং চওড়ার দিকে সার বেঁধে কলকার মোটিফ লক্ষ করা যায়। তবে দু'পাশে অর্থাৎ লম্বার দিকের বর্ডারে পাড়ের ডিজাইন এবং মাঝখানে বুটির মতো ফুল, লতা-পাতার ডিজাইনও দেওয়া হয়। এটি দু'পরতে তৈরি পাতলা কাঁথা।

সুজনি বা নকশিকাঁথাঃ কাঁথাশিল্পের সবচাইতে বিশাল ও মহত্তম উপস্থাপনা। এর একটি তৈরিতে বহু বছর লেগে যায় একজনের। একাধিক নারী মিলেও এটি তৈরি করতে পারে। কী কাজে ব্যবহৃত হবে তার ওপর নির্ভর করে এটি চারস্তর বিশিষ্ট পর্যন্ত হতে পারে। পার্শিয়ান শব্দ থেকে সুজনি শব্দটি এসেছে। এর অর্থ কারুকার্য খচিত করা বা চমকার সেলাই। সুজনিতে ব্যবহৃত ব্যাক স্টিচ ত্রয়োদশ শতকের মুসলিম অংকন দক্ষতার প্রতি ইংগিত করে। নকশা শব্দটিও উন্দু/পার্শিয়ান সূত্র থেকে নেয়া। এর অর্থ ডিজাইন। এখান থেকে এসে শব্দটি কাঁথার সাথে যুক্ত হয়ে গেছে। [আহমেদঃ **২০১৬ : ১৬**]।

অষ্টাদশ, ঊনবিংশ শতাব্দী নকশিকাঁথাতে প্রাচীন বৈদিক প্রতীকের সাথে মুসলিম ও ব্রিটিশ ইমেজের সম্মিলন চোখে পড়ে। হিন্দুমন্দির ও মসজিদের পাশাপাশি অবস্থান সাম্প্রদাযকি সম্প্রীতির কথাই মনে করিয়ে দেয়। আবার মুসলিম শিল্পীরা যখন ব্যবহার করছে ইন্দো-পার্শিয়ান চিত্র-শৈলীর ময়ুর, হিন্দুরা তখন ব্যবহার করছে সৌন্দর্যের দেবতা কার্তিকের বাহন ময়ুরের চিত্র।

নকশিকাঁথা বা সুজনি একজন গ্রামীণ নারীর প্রতিভার সর্বোত্তম প্রকাশ। নকশি কাঁথা তাকে একটি বিশাল ক্যানভাস দিচ্ছে যার মাধ্যমে সে প্রকাশ করছে একটি কাহিনী, মূর্ত করছে তার অনুভূতি আর উপভোগ করছে একটি উৎসবে শরিক হবার আনন্দ। এই কাঁথা অতিথিদের বসা বা শোয়ার জন্য বিছানায় বিছিয়ে দেওয়া হয়। এই ধরনের কাঁথা সাধারণত দৈর্ঘ্যে পাঁচ-ছ' ফুট এবং প্রস্থে চার-সাড়ে চার ফুট হয়। তবে এই মাপের একটু কম-বেশিও হতে পারে। এই কাঁথা আকারে বড় বলে এর কেন্দ্রবিন্দুতে যেমন পদ্মের মোটিফ থাকে, তেমনই পাড়ে কলকা, নানা লতা-পাতার ডিজাইনের বাহারও দেখা যায়। যশোর, ঝিকরগাছা, কুষ্টিয়া এবং নওগাঁ অঞ্চলে এর নাম নাছনি কাঁথা', 'পাড়নী কাঁথা' বা 'পাড়ের কাঁথা। তোফায়েল আহমদের মতে, চাপাইনবাবগঞ্জের সুজনি কাঁথার ওপরের পিঠে থাকে নতুন লাল শালু, নীচে ও মাঝখানে থাকে পুরনো কাপড়। বিয়ের উপহার হিসেবে ব্যবহৃত সুজনির তলার পিঠেও সাদা নতুন কাপড় থাকে এবং মাঝখানে অনেক সময় তুলার প্যাড দেওয়া থাকে। সুজনির অপর নাম বেলায়েতী। সেলাই-এর ধরন এক-ফুঁইড়া। দুই ফোঁড়ের মাঝখানকার ফাঁক দিয়ে পুনরায় সুতো চালিয়ে মেশিনের সেলাইয়ের মতো দেখায় এ কাঁথার সেলাই। এতে করে শালুর লাল জমিনে সাদা রেখাচিত্র ফুটে ওঠে অতি মিহিন ফোঁড়ে। অন্যান্য কাঁথার মতো নকশাগুলি ভরাট নয়। পুরো কাঁথাটা রেখাচিত্রে অলংকৃত। সুজনি কাঁথার আর-একটি বৈশিষ্ট্য হল কাঠের ব্লকে তার ডিজাইনগুলি ছাপ মেরে কাঁথার ওপরে মুদ্রিত করে নেওয়া। [আহমদঃ **১৯৯২ : ৬৩**]।

এই কাঁথায় ফুলের নকশা তোলা হয় ইরানি রীতিতে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বর বা অতিথিদের বসার জন্য এই কাঁথা পেতে দেওয়ার ঐতিহ্য এখনও লক্ষ করা যায়। এই কাঁথাতে শিল্পীরা তাঁদের স্বপ্নিল মনের চিন্তা-চেতনা এবং স্নেহভালবাসার আবেগ সুচ-সুতো দিয়ে বিচিত্র সেলাই করা নকশার মধ্যে দিয়ে অপূর্ব কারুকার্যময় করে ফুটিয়ে তোলেন। গুরুসদয় দত্তের মতে : The Sujni Kanthas, therefore represent the highest perfection of Bengal's ornamental needlework. [Dutta : 1990 : 106]

কেউ কেউ সুজনি কাঁথাকে দুভাগে ভাগ করেছেন-দোরোখা এবং আঁচল বুনুনি। দোরোখা কাঁথার দু'দিকই সমান। এই ধরনের কাঁথায় শিল্পীর দক্ষতা এত নিপুণ যে, সোজাপিঠ ও উলটোপিঠ খুব সুক্ষ্মভাবে না দেখলে বোঝা যায় না। এ ধরনের কাঁথার বিশেষত্ব হল, কাঁথার সামনের দিকের অংশটিতে ছোট ছোট ভাঙা ফোঁড় দিয়ে নকশা তোলা হয়। নকশি কাঁথার এক অসাধারণ শিল্পসুষমা লক্ষ করা যায় দোরোখা কাঁথার মধ্যে। দোরোখা কাঁথা সম্পর্কে অজিত মুখার্জী বলেছেন : Generally speaking, the embroideries in the Kanthas have a 'dorokha' or obverse and reverse character. Ordinarily the designs appear distinctly on the obverse face. In the most finished types of Kanthas, however, the stitches are so skilfully made that the details of each design appear in identical forms and colours on either face of the Kantha. Indeed, it is often extremly difficult, if not impossible, to distinguish the obverse face from the reverse face. [Mookherjee :1946 : 11].

জায়নামাজঃ তিনস্তর পুরোনো শাড়ি ব্যবহার করে, জায়নামাজ তৈরি হয়। এটি নামাজের সময় মাটিতে বিছানো হয়। এর প্রধান মোটিফ হিসেবে প্রায়ই মসজিদের ডিজাইন ব্যবহার করা হয়। এর প্রান্তদেশ ফুলের টব এবং লতাপাতার সাহায্যে ঘেরা থাকে। এর ডিজাইন সরল এবং মূলভূমিতে ঢেউ, পাহাড়, নৌকা, মাছ, চাঁদ এবং নক্ষত্রের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। [আহমেদঃ ২০১৬ঃ ১৭]।

বাংলাদেশের লোকজীবনধারায় গ্রামের মানুষ-মেয়েদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের মত নকশি কাঁথাও অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের বলে পরিগণিত হয়। ফলে নকশি কাঁথার সেলাই কাজটি একটি কৌশল বলে পরিগণিত হয়েছে। যা একান্ত বাংলাদেশের, এই কৌশল সেলাই, ফোড় নকশি কাঁথার বিচিত্র, মোটিফ সৃষ্টির মূল নিয়ামক। এ জন্য প্রতিটি মোটিফে একদিকে আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক-ধর্মীয় দিক বিধৃত, অপরদিকে ঐতিহ্যের, সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যময় সেলাই কৌশল ও দক্ষতা সম্পৃক্ত। মূলতঃ এ কারণেই নকশি কাঁথার প্রতিটি মোটিফের নাম স্থানিক ও কালিক বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ফলে বহু নামের বৈশিষ্ট্যের সেলাই, ফোঁড় স্থানিক ও কালিক ব্যবধানে পরিচিত হয়েছে। এক একটি অঞ্চলের মেয়েদের সেলাইয়ের ফোঁড় বৈচিত্র্যময় মোটিফ তৈরির জন্য উদ্ভাবিত হয়েছে। অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য, লোক সাহিত্য, লোকবিশ্বাস যুক্ত হয়েছে। ফলে বাংলাদেশের মেয়েদের বৈশিষ্ট্যময় কৌশল সেলাই বা ফোঁড়ের নাম হয়েছে লোকসমাজের সার্বজনীন নাম লিকফোঁড়, পাটিফোঁড়, চাটাইফোঁড়, ক্যাত্যাফোঁড়, ভরাটফোঁড়, বেকী, দোফড়া, তাড়াজোড়াফোঁড়, পাটি বান্ধা ফোঁড়। এসব ফোঁড়ে অঞ্চলভেদে বিশেষ অঞ্চল বিশেষ ধরনের মোটিফ তৈরির উপযোগী বলে সনাক্ত হয়েছে। স্থানীয় কৌশল নকশি কাঁথাকে বৈশিষ্ট্যময় করেছে। কখনো কখনো একই চিত্রগুণ সম্পন্ন মোটিফ অঞ্চলভেদে ভিন্ন ভিন্ন নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। একটি ছবি আঁকতে শিল্পীর যেমন প্রয়োজন রংএর তেমনি নকশি কাঁথার শিল্পী গ্রামের মেয়েদের প্রয়োজন হয় প্রচলিত ঐতিহ্যের কৌশল সেলাই বা ফোঁড়ের মাধ্যমে মোটিফ গড়ে রং ও রেখা সৃষ্টি করা। এ কারণেই কৌশলের, ফোঁড়ের এত নাম।

ফোঁড়ের সাহায্যেই মোটিফ তৈরি হয়। তৈরি হয় তাগা, সারি, পাড়, লাইন, কিনারা, আচলা। বাংলাদেশের অঞ্চলভেদে বিচিত্র নামে উল্লিখিত সারি, লাইন, তাগার নাম পাওয়া যায় যেমন আনাজ তাগা, তাবিজ পাড়, শামুক তাগা, শাড়ির পাড়, পিপড়ার সারি, ফুলপাড়া, পাঁচ তাগা, নোলক তাগা, মইতাগা, মালাগা, মাছগা, ঝোপতাগা, চোখপাড়, চিকতাগা, বিছাতাগা, বিছাপাড়। এসব লাইন, সারি নকশি কাঁথার কেন্দ্রীয় মোটিফকে ফুটিয়ে তুলতে গুরুত্ব, মর্যাদা এবং জমিনে মোটিফগুলোকে চিত্রগুণ প্রদানে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া যেসব অপ্রধান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোটিফ দিয়ে নকশি কাঁথার জমিনে চিত্রগুণ ও

বুণটগুণে বৈচিত্র্য আনা হয় সেগুলো হচ্ছে মুশুরী, মটরদানা, কবুতরখুপী, গোলক ধাঁধা, ধানের শীষ, বরফী, সখী, শংখলতা, মোচড়া ফুল, মাকড়শা, জিলাফি, বাঘেরপারা ইত্যাদি। এসব মোটিফের নাম এদেশের লোকজীবনধারায় অতি পরিচিত। [আলমঃ ২০১০ :৭৯]

এদেশে মুসলমানদের আগমন অর্থাৎ আরব মুসলিম ব্যবসায়ী, পীর, ফরিকদের বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস এবং স্বাধীন সুলতানী ও মোগল শাসন ও ইসলামী সংস্কৃতি ও জীবনধারা এদেশের গ্রামীণ লোক জীবনধারা-লোক সংস্কৃতিতেও প্রভাব ফেলে। ইসলামী সংস্কৃতিধারা বাংলাদেশের গ্রামীণ লোকসমাজের লোকসংস্কৃতির উপাদান-লোক ও কারুশিল্পে প্রতিফলিত হয়। সাংস্কৃতিক সাঙ্গীকরণ প্রক্রিয়ায় ইসলামী সংস্কৃতি ও শিল্পকলার নানা প্রভাব, অনুষঙ্গ বাংলাদেশের লোকজীবনের সংস্কৃতিতে, লোক ও কারুশিল্পে স্থান করে নেয়। লোকসংস্কৃতির উপাদান ও সংস্কৃতি পরিবেশে রূপান্তর প্রক্রিয়া চলে। আমাদের লোকসংস্কৃতির বহু উপাদান যেমন নকশি কাঁথা সাঙ্গীকরণ প্রক্রিয়ায় কালিক ব্যবধানে রূপান্তরিত হয় ব্যবহারে, নামে । নকশি কাঁথার পুরানো ধারায় রূপান্তর ঘটে। নকশি কাঁথার জগতে স্থান করে নেয়। পরিণত হয় লোকসংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদানে, পরিবেশে। যেমন দস্তরখান, জায়নামাজ, কুরআন শরীফের গিলাফ, কবর বা মাজারের ঢাকনা, গিলাফ, রুমাল, বর্তন ঢাকনী, তসবীর থলিয়া নকশি কাঁথা এসব রূপ, গড়ন ও বৈশিষ্ট্যে এবং নামে রূপান্তরিত হয়েছে। ইসলামী সংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রভাবে সাংস্কৃতিক সাঙ্গীকরণ প্রক্রিয়ায় নকশি কাঁথা-বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির উপাদানের এই রূপান্তর হয়েছে। ইসলামী সংস্কৃতি ও জীবন ধারার প্রয়োজন মেটাতে নকশি কাঁথায় নতুন বৈশিষ্ট্যের উদ্ভাবন হয়েছে। সংস্কৃতির রূপান্তর প্রক্রিয়ায় নকশি কাথায় এই রূপান্তর ঘটেছে। পরবর্তীতে অর্থাৎ ১৯৮০র পরে নকশি কাঁথার ব্যবহারে আরো রূপান্তর ঘটে। আধুনিক কনজুমার সমাজ, পর্যটন, আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন পত্রপত্রিকা, টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্রের প্রভাবে সারা বিশ্বে লোকসংস্কৃতির জগৎ ও লোকসমাজের জীবনধারায় ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে। এ সবের প্রভাব লোকসংস্কৃতিতে অনিবার্যভাবে পড়ে। ফলে আবহমান বাংলার লোক সমাজের সংস্কৃতির উপাদান বাংলার নিভৃত পল্লীর জীবনধারার ব্যবহারের জিনিস নকশি কাঁথা থেকে রূপান্তরিত হয়েছে আধুনিক নগর জীবনের, শখের, রুচির, আধুনিক নানা জিনিসে যেমন মেয়েদের আধুনিক ফ্যাশনের পোষাক পরিচ্ছদ, শাড়ি, ভ্যানিটি ব্যাগ, অলংকার বাক্স, চশমার বাক্স, ওয়েস্টকোট, দেয়ালের শোভাবর্ধনকারী ফ্রেমকাঁথা, নানা ধরনের হাত ব্যাগ, ব্রিফকেস, মেয়েদের শাল, বিছানার আধুনিক চাদর, টেবিল ক্লথ ইত্যাদি। পুরানো মোটিফের সঙ্গে নতুন আধুনিক মোটিফ, কখনো বিদেশি মোটিফে নকশি কাঁথার ঐতিহ্য-কৌশল, দক্ষতার সাহায্যে তৈরি নকশি কাঁথাকে একটি মাধ্যম হিসেবে উল্লিখিত জিনিসসমূহ তৈরি করা হয়েছে। ব্যবহারে আমূল পরিবর্তন এসেছে, নকশি কাঁথা রূপান্তরিত হয়েছে নবরূপে ও বৈশিষ্ট্যে। [আলম : ২০১০: ৮০-৮১]

নকশি কাঁথা বাংলার গ্রামীণ লোকজীবনের সাংস্কৃতিক রূপবৈচিত্রের সৃজনশীলতায় পরিপূর্ণ। আমাদের দেশে নকশি কাঁথায় যে ধরনের মোটিফ দেখা যায় তা হল পদ্ম, অষ্টদল, শতদল, পদ্মচক্র, সূর্য, চরকা, স্বস্তিকা, জীবনবৃক্ষ, গ্রাম্যজীবন ইত্যাদি। পুরনো কাপড় একের পর এক ভাজ করে তার চার ধার সেলাই করে কাঁথা সেলাইয়ে মোটিফের কাজ করা হয় এবং সেলাইকারী সুবিধা ও মাপমতো মাঝখান থেকে সেলাই করে নকশা করেন। সবশেষে সাদা অংশগুলোতে সাদা সুতা দিয়ে জমিনের অংশ সেলাই করা হয়। অবশ্য আঞ্চলিকতার কারণে মোটিফের ডিজাইনে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। নকশি কাঁথার একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা গেলে সেখানে একটি নকশি কাঁথার সাথে অন্যটির কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। ডিজাইনের মোটিফে রং-এর আকারে বৈশিষ্ট্য কিংবা সুতোর মধ্যে পার্থক্য থাকবেই। [সায়েমঃ ২০১৪ : ১৭৩]

গ্রামের মেয়েরা নকশি কাঁথার রূপকার, শিল্পী। বাংলাদেশের লোক জীবন ধারা লোকসংস্কৃতি এদেশের প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের জীবনধারার সমন্বয়ে সৃষ্টি ও বিকশিত হয়েছে।

আবহমান বাংলার এই জীবনধারায় সম্পৃক্ত এদেশের মেয়েরা তাদের অনুভব ও চেতনায় যে সব চিত্রকল্প সহজে, অবলীলাক্রমে নির্মাণ করতে পারেন তা-ই নকশি কাঁথায় সেলাইয়ের সাহায্যে রং বেরং নকশার, চিত্রগুণের মোটিফে ফুটিয়ে তোল। ফলে নকশি কাঁথার এক একটি মোটিফ বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির উপাদান, সংস্কৃতি পরিবেশে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের প্রকৃতি ও পরিবেশ, লোকজীবন ধারা এবং প্রতিবেশকেন্দ্রিক মোটিফসমূহের সাধারণ অনাড়ম্বর চিত্রগত অবস্থান, সজ্জা নকশি কাঁথার জমিনকে লোকজীবনের, জীবনধারার দলিলে পরিণত করেছে। মোটিফ সম্পর্কে Encyclopaedia of Anthropology তে উল্লেখ করা হয়েছে "A motif is regularly recurrent thematic element in a body of art or folklore" এখানে Thematic element বলতে মোটিফের বিষয়বস্তু, বক্তব্যের কাঁথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নকশি কাথার মোটিফের বিষয়বস্তু বা বক্তব্যগুলো ধর্মীয় লৌকিক সংস্কার, উৎসব-অনুষ্ঠান, পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ভূদৃশ্য ও গার্হস্থ্য জীবনের খুটিনাটি এবং শিল্পীর সমসাময়িক কালের খণ্ড খণ্ড ঘটনা। এবং এসবের চিত্রগত রূপই হচ্ছে মোটিফ। এসব বিষয়বস্তু ও বক্তব্যকেন্দ্রিক কেন্দ্রীয় মোটিফগুলোকে ফুটিয়ে তুলতে, দৃশ্যমান করতে পরিপূর্ণ নকশার জমিন সৃষ্টিতে অপ্রধান মোটিফ-নকশাও শিল্পী সৃষ্টি করেন। এগুলোও কেন্দ্রীয় মোটিফের বৈশিষ্ট্যের মত পৌনঃপুনিক। এতে বক্তব্য, বিষয়বস্তু সম্পৃক্ত থাকে না। তবে অপ্রধান মোটিফগুলো কেন্দ্রীয় মোটিফের বক্তব্য ও বিষয়বস্তুকে উপস্থাপনে, সম্পূর্ণতাদানে প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করে, সহায়ক মোটিফ হিসেবে। এ জন্য এ সব মোটিফকে অপ্রধান বা সহায়ক মোটিফও বলা যেতে পারে । এ সব সহায়ক মোটিফ সৃষ্টির লক্ষ্য ও উপলক্ষ্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় মোটিফের সৃষ্টিকে পরিপূর্ণ, উজ্জ্বল, বর্ণাঢ্য এবং চমৎকার করা এবং একান্ত মোটিফ সম্পৃক্ত বলেই এগুলোকে অপ্রধান বা সহায়ক মোটিফ বলা যায়।

পুরানো নকশি কাঁথার মোটিফ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে নকশি কাঁথায় সাধারণতঃ জমিনের মাঝখানে একটি কেন্দ্রীয় অলংকৃত পদ্ম বা পদ্ম সমষ্টি এবং চার কোনায় চারটি জীবনবৃক্ষ কোনাকুনিভাবে শোভা পায়। কখনো কেন্দ্রীয় মোটিফ কেবল জীবনবৃক্ষ, এ ধরনের নকশি কাথাও দেখা গেছে এবং জমিনে কেন্দ্রীয় মোটিফ স্থাপনের পর অবশিষ্ট ফাঁকা জায়গায় অসংখ্য, বিচিত্র ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপ্রধান মোটিফ শোভা পায়। আর একটি পদ্ধতি, যা নকশি কাঁথায় সেলাইয়ের সাহায্যে পুরানো শাড়ির পাড়ের নকশার পুনরাবৃত্তিকরণ। পুরানো নকশি কাঁথার মোটিফগুলো নানাশ্রেণীর (১) লোকজ বিশ্বাস, ধর্মীয় ও পদ্ম, সূর্য, পানি, মাছ, বুথ, পৃথিবী, জীবনবৃক্ষ, (২) একান্ত মেয়েদের ব্যবহার্য ও আয়না, চিরুনী, অলংকার, আলতা, (৩) রান্না ঘরের জিনিসপত্র ঃ হাঁড়ি বাসন, দাও, বটি, সরতা, হাতা, চালনি, (৪) কৃষি সরঞ্জাম ও কুলা, ঢেকী, কাহাল, কাচি, দাও, (৫) প্রকৃতি বিষয়ক ও গাছ, লতাপাতা, ফুল, পাখি, ঘোড়া, বিড়াল, পেঁচা, (৬) উৎসব চিত্র ও বিয়ের বরযাত্রী, পালকিতে নতুন বউ, রথযাত্রা, নৃত্যরত নরনারী, শিকারী । এসব মোটিফের সাধারণ প্রচলিত সংস্থাপন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে নকশি কাঁথা তৈরি হলেও এতে স্থানিক ও কালিক ব্যবধানে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। তবে সকল ধরনের নকশি কাঁথায় বাংলাদেশের প্রাত্যহিক গার্হস্থ্য জীবনের, প্রকৃতির পরিবেশকে গ্রামের সাধারণ মেয়েরা ঐতিহ্যিক ধারায় মনের মাধুরী মিশিয়ে সৃষ্টির মোটিফ, নকশা, চিত্র আঁকেন রঙিন সুতায় সেলাইয়ের মাধ্যমে নকশি কাঁথায় ব্যবহৃত কেন্দ্রীয় মোটিফ অষ্টদল, শতদল, সহর্স দল পদ্ম প্রাচীন ধারার। এতে লোকজ, বৈষ্ণব, তান্ত্রিক আধ্যাত্মিকতার মাহাত্ম ও গুরুত্ব সম্পৃক্ত হয়েছে। এছাড়া এই মোটিফের প্রাচীনত্ব সিন্ধু সভ্যতার সময়কালের বলে পন্ডিতদের ধারণা। পরবর্তীকালে কেবল বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক সাংস্কৃতিক উপাদান যোগ হয়ে এই প্রাচীন মোটিফটির নতুন ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা হয়েছে মাত্র। [আলম: ২০১০ : ৮১-৮৩]

একজন নারীর জীবনের গল্প অথবা তার আশা-আকাঙ্খা সবসময় বাস্তবধর্মীরূপে চিত্রায়িত না হয়ে, প্রতীকের মাধ্যমেও প্রকাশ পায়। কাঁথা বিষয়ক বেশিরভাগ লেখক মোটিফ এবং আত্মিক সাদৃশ্যের জন্য কাঁথা এবং আলপনার মধ্যে যোগসূত্রের নির্দেশ করেন। উদাহরণস্বরূপ, সেঁজুতি ব্রতে

আলপনা অঙ্কন করা হয় বৃত্ত বা মণ্ডলের মাঝখানে পদ্ম দিয়ে। সূর্য, চন্দ্র, গহনা, একটি নৌকা, একটি পালকি মোটিফ হিসেবে যুক্ত হয়। অন্যান্য আলপনায় অঙ্কন করা হয় পশু, গাছ, পদচিহ্ন এবং ভক্তের নিজের অথবা যার জন্য ব্রত পালন করা হচ্ছে তার আকাঙ্খার বস্তু। যেসব আলপনা পরিবারের পুরুষ সদস্যদের মঙ্গলের জন্য ব্রত, প্রতিজ্ঞা এবং প্রার্থনায় ব্যবহার করা হয়, সেগুলির সাথে অন্তর্ভুক্ত হয় জল এবং নৌকা। লক্ষ্মীপূজার আলপনায় আঁকা হয় গহনা এবং যুগলসহ পালকি। এসব প্রতীকের অনেকগুলিই চিত্রলিপির মতো এবং শুধু আকাঙ্ক্ষার বস্তুই নয়, সম্ভবত নারীর উপস্থিতির চিত্রণও বটে, এগুলি কাঁথা প্রস্তুতকারিণীর একটি 'স্বাক্ষর'। বাংলা হতে বহুদূরে সিন্ধুর চৌকন্দি সমাধিতে দেখা যায় নারীর সাথে কানের দুল ও বালা সম্পর্কিত। পুরুষদের সমাধিতে পাগড়ি এবং নারীদের ক্ষেত্রে বালা ও কানের দুল চিত্রিত করা হয়েছে।

আরও অন্যান্য মোটিফ কৃষিভিত্তিক সমাজের পরিবেশকে নির্দেশ করার সাথে হয়ত নারীর উপস্থিতিকেও নির্দেশ করে। উদাহরণস্বরূপ কুলা যেমন সাধারণত ফসল তুলে ঘরে আনার প্রতীক হিসেবে গৃহীত এবং সে কারণে প্রাচুর্যেরও প্রতীক। এটা নারীদের উপস্থিতিও নির্দেশ করতে পারে, কারণ বধূ ও কন্যারাই ধানসিদ্ধ ও ঝাড়তে সাহায্য করে। ফসল তোলার পর এখনও গ্রামের একটি অতি সাধারণ দৃশ্য হল নারীরা দুবাহু তুলে কুলা থেকে তুষ ঝড়িয়ে ভূষি থেকে চাল আলাদা করছে। কাঁথা শিল্পী জীবন কর্ম করতে করতেই বিষয় বাছাই করত। বৈবাহিক সূত্রের চিন্তায় সে ব্যবহার করত শংখ, সিঁদুর, কান বা নাকের রিং ও আয়না। গার্হস্থ্য সমৃদ্ধির চিন্তা থেকে সে ব্যবহার করত কলস, লাঙ্গল, ধানের ছড়া, নৌকা, গাবদি পশু, মাছ এবং উদ্ভিদ প্রতীককে।[আহমদেঃ ২০১৬ঃ ১৬]

অন্যান্য বহুল ব্যবহৃত মোটিফে উপস্থাপিত হচ্ছে নারীর হৃদয়। ময়ূর যদিও বাংলার দেশীয় পাখি নয় তবুও তা কাঁথা শিল্পের একটি জনপ্রিয় মোটিফ। ময়ূর সাধারণত দেবতা কার্তিকের প্রতীক, কিন্তু ভারতীয় চিত্রে। প্রায়শই ময়ূর অনুপস্থিত প্রেমিকের সাথে সম্পর্কিত। এজন্য বলা যায় যে, ময়ূরের জনপ্রিয়তা হয়তো নারীর কামনার সাথে সম্পৃক্ত। উনবিংশ শতাব্দীর ফরিদপুরের একটি কাঁথায় দুটি নারীমূর্তি আছে যারা দুজনই ময়ূর আলিঙ্গনরত।

ধারণা করা হয় কলকা ভারতে এসেছে পারস্য হয়ে যেখানে এটা সাধারণভাবে একটা পাতার প্রতীক। এটা বিচিত্ররূপে সম্পৃক্ত হয়েছে একটি শিখা, একটি আম, একটি গাছ, ইন ইয়াং প্রতীকের অর্ধেকের সাথে। কলকা কন্দাকার নিম্নাংশ একটি নারীর শরীরের ব্যঞ্জনা করে। কোন কোন মোটিফে দেখানো হয়েছে কলকা থেকে অন্যান্য কলকা পল্লবিত, এবং এরূপে এটি আলপনার একটি উর্বরতার প্রতীকের সাথে খুব সাদৃশ্যপূর্ণ। যদি কলকা গাছের প্রতীক হয়ে থাকে তবে এটা নির্দেশ করে জীবনবৃক্ষকে যা ঘনিষ্ঠভাবে নারীর সাথে সম্পৃক্ত। [জামানঃ ২০০৭ঃ ৫৫০]

পরবর্তীতে কালিক ব্যবধানে প্রাচীন মোটিফ বৈশিষ্ট্যের কাঁথায় হিন্দু ও মুসলমান মেয়েদের তৈরি নকশি কাঁথায় মোটিফের ব্যবহারে পার্থক্য সূচীত হয়। যেমন হিন্দু মেয়েরা যেখানে অষ্টদল, শতদল বা সহস্রদল কেন্দ্রীয় মোটিফকে বৃত্তাকারে ঘিরে জীবজগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ সৃষ্টির জন্য জন্তু, কীট, পতঙ্গ, মানুষ, গার্হস্থ্য জিনিস পত্রের মোটিফ সৃষ্টি করেন, সেক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েরা জীবজন্তু বা মানুষের পরিবর্তে চন্দ্র, সূর্য, তারা, নক্ষত্র, লতাপাতা ইত্যাদি মোটিফগুলোকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছে। এছাড়া যেখানে হিন্দু মেয়েদের তৈরি নকশি কাঁথায় মন্দির, রথ, রাধাকৃষ্ণ, ত্রিশূল, সংখ, লক্ষ্মীর পা, গদা, চক্র ইত্যাদি মোটিফ নকশি কাঁথায় শোভা পায়, সেক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েরা কাঁথায় মিনার, ঈদের চাঁদ, মিহরাব, মসজিদ, মুহররমের তাজিয়া ইত্যাদি ইসলামী মোটিফ ফুটিয়ে তোলে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে, মিহরাব, মিনার ও চাঁদতারার মোটিফসমৃদ্ধ জায়নামাজের কাঁথার উদ্ভব হয়েছে এবং পরিণত হয়েছে বাংলার লোকসংস্কৃতির উপাদানে। দুশো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনকালে গ্রামের মেয়েদের নকশি কাঁথায় ইংরেজ শাসকশ্রেণীর অনেক ছবি, স্মৃতি মোটিফ হয়ে ফুটে উঠেছে। যেমন শোলার হ্যাট কোট পড়া গোড়া সাহেব, ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন সাহেব। এছাড়া এরোপ্লেন, মোটর

গাড়ি, হারমোনিয়াম ইত্যাদি নতুন নতুন অপ্রচলিত মোটিফ গ্রামের মেয়েরা ব্যবহার করে নকশি কাঁথায় মোটিফের ব্যবহারে রূপান্তর ঘটিয়েছেন। এখানে উল্লেখ্য যে, পুরানো ঐতিহ্যের নকশি কাঁথায় মোটিফের বৈশিষ্ট্য অষ্টদল, শতদল এবং সহস্রদল পদ্ম এবং জীবনবৃক্ষের পাশাপাশি উপরোক্ত অপ্রচলিত নতুন ধরনের মোটিফ সৃষ্টি করে গ্রামের মেয়েরা নকশি কাঁথার রূপান্তর প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রেখেছে। [আলম: ২০১০: ৮৪]

কাঁথার প্রতীকগুলি বাংলার পরিবেশ ও সংস্কৃতিগত। কাঁথাশিল্পী তাঁর চারপাশে যা দেখেছেন তাকেই আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সূচিশিল্পের নকশার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। কাঁথার কিছু মোটিফ প্রাচীন প্রতিবিম্বে লক্ষ করা যায়, যার মধ্যে দিয়ে মানুষ সারা বিশ্বকে দেখে। কিছু মোটিফ যেমন-সূর্য, চন্দ্র, পদ্ম, জল সর্বব্যাপী। চিন বা ইরান থেকে কিছু মোটিফ ভারতবর্ষ গ্রহণ করেছে। যেমন- ইরানের জীবনবৃক্ষ বা কলকা বাংলার কাঁথায় ব্যবহৃত হয়েছে। জল অতি পরিচিত মোটিফ। প্রত্যেক ধর্মে জলকে প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, যেমন খ্রিস্টধর্মের ব্যাপটিজমের আচার, মুসলিমদের ওজু এবং হিন্দুদের গঙ্গাস্নান। [বসাক : ২০০২ : ৬৮]

কাঁথায় প্রায়শই কিছু লেখার ব্যবহার দেখা যায়। একটি কাঁথায় আমরা নকশি করা কাঁথায় জানতে পারি যে এটা বরের জন্য তৈরি করা- বাদশাহর বসিবার। আসন, কাঁথা প্রস্তুতকারিণী জানায় যে কাঁথাটি কনের মাতা তৈরি করেছে- মাজানের মাতার তৈয়ারি। অন্য একটি কাঁথায় প্রস্তুতকারিণী যার জন্য কাঁথাটি প্রস্তুত করেছে তার নাম, ঠিকানা এবং প্রস্তুতকারিণীর সাথে তার সম্পর্ক লিখে দিয়েছে, শ্রীমানের মাতার তৈয়ারি। একটি কাঁথায়, প্রস্তুতকারিণীর নাম কেন্দ্রের মণ্ডলের নকশির অংশ হয়ে গেছে এবং বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় লেখা হয়েছে-S.B. Debi Nohata ১৯১৯ শ্রীমতি সরলাবালা দেবী নোহাতা। নোয়াপাড়া হতে অন্য একটি জায়নামাযের কাঁথায় সাদামাটাভাবে লেখা হয়েছে- মোসাম্মৎ মরিয়ম বিবি। অনেক কাঁথার হিজিবিজি লেখার অর্থ উদ্ধার করা না গেলেও, কলকাতার ঠাকুর পুকুরের গুরুসদয় জাদুঘরের একটি নিখুঁত চমৎকার কাঁথায় পরিষ্কার, সহজপাঠ্য বাংলা ক্যালিগ্রাফি মণ্ডলের চারিদিকে বিন্যস্ত। যেমন সরলাদেবীর কাঁথায়, তেমনি মনদা সুন্দরীর অভিলিখন স্থান পেয়েছে কাঁথার মধ্যখানে, মণ্ডলের চারিদিকে। এর পাঠ- "এই সজনী (সুজনী) লাঙ্গল বন্ধন নিবাসী বড়দা কান্ত বসুর কন্যা আমি শ্রীমতি মনদা সুন্দরী দাস মম হস্তে প্রস্তুত পূর্বক শ্রী দত্ত পিতা- ঠাকুর মহাশয়ে এ সজনী প্রণাম পূর্বক দিলাম। সভ্যগণ মহাশয়েরা এ ত্রুটি হয় মাপ করিবেন।" অন্যান্য কাঁথায় হিন্দু উপকথা অবলম্বনে পৌরাণিক দৃশ্যসমূহ আঁকা হয়েছে: যেগুলির শিরোনাম দেওয়া হয়েছে ভারতীয-পতুর্গিজ কাঁথার মতো করে। ছোটে ভারনীর (Chottey Bharany) ব্যক্তিগত সংগ্রহের একটি কাঁথায় হরে কৃষ্ণ হরে রাম' শব্দগুলি বার বার কাঁথার সর্বত্র ব্যবহার করা হয়েছে। কিছু কাঁথা প্রস্তুতকারিণীরা পরোক্ষভাবে হলেও হয়তো ইংরেজি ভাষার সাথে পরিচিত ছিল। জয়নুল আবেদিনের সংগৃহীত একটি যশোর কাঁথা, যেটি উজ্জ্বল গোলাপী উল ব্যবহারের জন্য উল্লেখযোগ্য, সেটিতে House শব্দটির বানান করা হয়েছে "HAUSE". [আহমেদ :২০০৭: ৫৫২-৫৫৪]।

কাঁথা বঙ্গনারীর সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক। তাই কাঁথার ছেঁড়া অংশ কাঁথাশিল্পীর শিল্পনৈপুণ্যে চমৎকারভাবে ঢাকা পড়ে যায়। নকশি কাঁথা সেলাই করার সময় জোড়ের অংশ এমন সুক্ষ্ম অথচ নিপুণভাবে গুপ্ত থাকে, যাতে জোড়ের সংযোগস্থল বুঝতেই পারা যায় না। আবার যখন চিত্রায়তি নকশা অত্যধিক বিস্তারিত করা হয়, তখন চিত্তাকর্ষক ভাবান্তর উদ্রেকের ইচ্ছাকে প্রশমিত রাখার জন্য এক রঙের সুতো (সাদা অথবা হালকা নীল) ব্যবহার করা হয়। কাঁথার এই বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেন-নকশাগুলির মূলে একটা ঐক্য এবং সন্নিবদ্ধতা (System) সহজেই চোখে পড়ে। কাঁথার গায়ে ফোটানো এইসব নকশাগুলি কাঁথার ব্যবহারিক দিকটাকে অনুল্লেখযোগ্য করে এর ইঙ্গিতময়তার দিকটাকেই বড় করে তোলে। কাঁথার বৈশিষ্ট্য সাধারণ সুচিশিল্প থেকে কাঁথা-

শিল্পকে একটু কৌলিন্য সম্পন্ন এবং স্বতন্ত্র করে রেখেছে। [গঙ্গোপাধ্যায় : ১৩৬৮ : পৃ. ৬৬]। [বসাক : ২০০২ : ১৫]

যদিও কাঁথা প্রস্তুতকারিণী তার চারিদিকে যা দেখেন তাই চিত্রায়িত করেন- বাস্তব জীবন, উপাসনালয়ের, এমনকি তার কল্পনা দিয়ে পরোক্ষ অভিজ্ঞতাকেও তিনি তুলে ধরেছেন- তদুপরি তিনি কাঁথা শিল্পকে ব্যবহার করেন তাঁর আশা, ভীতি, তার দুঃখ ও আনন্দ প্রকাশে। যে নারীরা কাঁথা সেলাই করে তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লিখেন নি। কিন্তু কবি জসীমউদদীন তাঁর কল্পনা দিয়ে চিত্রণ করেছেন একজন গ্রামের নারী কিভাবে কাঁথা নকশি করেন তাঁর নিজের জীবনবোধ ও অভিজ্ঞতা দিয়ে। নকশি কাঁথার মাঠ-এ জসীমউদ্দীন বর্ণনা করেছেন কিভাবে সাজু তার স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছে। তার স্বামী একটা বিবাদের পর গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে, সে সুচ দিয়ে কাঁথায় ছবি আঁকছে:

"নকশী কাঁথাটি বিছাইয়া সাজু সারারাত আঁকে ছবি,
ও যেন তাহার গোপন ব্যথার বিরহিয়া এক কবি।
অনেক সুখের দুখের স্মৃতি ওরি বুকে আছে লেখা,
তার জীবনের ইতিহাসখানি কহিছে রেখায় রেখা।" [জামান : ২০০৭: ৫৪৯]

কাঁথা বাঙালির জীবনচর্যার সঙ্গে কত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তা সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়। বহু প্রাচীনকাল থেকেই সাহিত্যে কাঁথার উল্লেখ পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃত, নাথগীতিকা, চন্দ্রাবতীর রামায়ণ, অন্নদামঙ্গল, পূর্ববঙ্গগীতিকার মধ্যে কাঁথার উল্লেখ যেমন আছে, তেমনই কাঁথা ও কাঁথা-সেলাইকে কেন্দ্র করে ছড়া, প্রবাদ, ধাধা, গান, কাব্য-কবিতা ইত্যাদিও রচিত হয়েছে। এ ছাড়া কাঁথার মধ্যে সংস্কৃত শ্লোক, শিক্ষা- সমন্ধীয় উপদেশ, আশীর্বচন ইত্যাদি রূপলাভ করেছে। [বসাক: ২০০২ : ১৩১]

চন্দ্রাবতীর রামায়ণে সীতার নানা গুণাবলীর মধ্যে কাঁথা সেলাইয়ের গুণের কথা চমৎকারভাবে বর্ণিত হযছে :

সীতার গুণের কথা কি কহিব আর।
*   *   *   *
কন্থায় আকিল কন্যা চান্ সূরুয পাহাড়।
আরও যে আকিল কন্যা হাসা আর হাঁসি।
চাইরো পাড়ে আকে কন্যা পুষ্প রাশি রাশি। [সিদ্দিকী: ১৯৯৫ : ৯]

কাঁথা যে বাঙালি জীবনের সঙ্গে কতখানি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তা বোঝা যায় যখন আমরা রূপকথায় কাঁথায় উল্লেখ পাই। দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'র 'কলাবতী রাজকন্যা' গল্পে আছে : সুরঙ্গ পার হইয়া বুদ্ধ দেখিল, এক যে-রাজপুরী-যেন ইন্দ্রপুরীর মত। কিন্তু সে রাজ্যে মানুষ নাই, জন নাই, কেবল এক একশ বচ্ছুরে বুড়ী বসিয়া একটি ছোট কাঁথা সেলাই করিতেছে। বুড়ী বুদ্ধুকে দেখিয়াই হাতের কাঁথা বুদ্ধুর গায়ে ছুড়িয়া মারিল। [দক্ষিণারঞ্জন : ১৩৮৬: ১৪]।

বহু মেয়েলি ছড়াতে কাঁথার বর্ণনা দেখা যায়। বিশেষ করে শিশুর কাঁথা সম্পর্কে ছড়া শোনা যায়, যেমন :

আধ অঙ্গ খাইছিল মায়ের শুয়ে আর পুতে।
আধ অঙ্গ খাইছিল মায়ের মাঘ মাইস্যা শীতে।।
নিজের অঙ্গের কাঁথাখানি যাদুর অঙ্গে দিয়া।
সারা নিশি গোয়াইল মায় জাগিয়া বসিয়া ।। [সিদ্দিকী:১৯৯৫: ৯]।

বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে গায়ে হলুদ (অনেক জায়গায় 'তেলাইর বলা হয়) এবং কন্যার বিয়ের সময় যে গান গাওয়া হয়, তাতে কাঁথাকে নিয়েও গান গাইতে শোনা যায়। এই গীতগুলি খুব পুরনো,

অঞ্চলভেদে ভাষার দিক দিয়ে এই গীতগুলির মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। মেয়ের বিয়েতে গান গাওয়ার সময় সীতার তুলনা দেওয়া হয়। যারা বিয়ের আসরে গান আগে গাইত তাদের বলা হত গীতালি বেটি বা গীতালি বিবি। কাঁথা সেলাইয়ের সময় গান গাওয়া হয় না। ছেলের বাড়িতে বিয়ের সময়েও এই গান গাওয়া হয় না। মেয়ের বাড়িতে আড়াই দিন ধরে গান গাওয়া হয়। মেহেন্দিবাটা, গায়ে হলুদ, চোখে সুর্মাদান, শাড়ি-গহনা পরানো অর্থাৎ সম্পাদানের পূর্ব পর্যন্ত এই গান গাওয়া হয়। কন্যার বিয়ে হয়ে গেলে আর গান গাওয়া হয় না। এই ধরনের কিছু উদাহরণ এখানে তুলে ধরা হলঃ

ঢোল করতালের তালে তালে।
কন্যা সাজাই আমরা বালিরে সাজাই গো।
বরণকুলা লইয়া আমরা বালিরে বসাই গো।
সেই না মায়ের ঝিল মিল নকসী না কাঁথায় গো।
সেই যে আরসি লতা না কাঁথায় গো।।

কিংবা

সেই না কাঁথায়য লিইখ্যা থইছে হাসাহাসির জোড়া গো।
সেই না কাঁথা লিইখ্যা থইছে ময়ূর পংখীর জোড়া গো।
এই কথা কথা নয় রে আরও কাঁথা আছে।
সেই কথার মধ্যে মধ্যে বুটি তোলা গেছে।

আবার বিয়ে পরে স্বামী-সোহাগিনী স্ত্রীর মানসিক অবস্থাটি কীরূপ, তাও গীতের মধ্যে ধরা পড়েছে, যেমনঃ

সেই না কথায় আঁইকা থইছে কত রঙের ঘোড়া গো।
পশু পংখীর জোড়া গো।
কাঁথা না বিছাইয়া, কাঁথা না সিলাইয়া,
ভাবুইন কন্যা প্রাণ বন্ধুর কাঁথা গো। [বসাক, শীলা, বাংলার নকশি কাঁথা, পৃষ্ঠা-১৩৮]।

একটা গীতে শোনা যায় :

আইসাছে বেটির দামান ওই না দরজায় রে।
আসুক আসুক বেটির দামান
কিছুর চিন্তা নাই রে।
বাইর বাড়ী বিছাইয়া থুইছি
আরশিলতা কাঁথা নারে....।
কামরাঙ্গা কাঁথা নারে.......।

বিয়ের অনুষ্ঠানে নকশি কাঁথা বিষয়ক একটি বিয়ের অনুষ্ঠানের গীত গান মাস্টারবাড়ি, ভালুকা, ময়মনসিংহ এলাকায় শোনা যায়। গানটি উল্লেখ করা হল :

তুমি নকশি কাঁথা বুনতে গিয়ে
আমাকে বুনাও
রূপ কলসী কাঙ্খে তোমার
পাগল বানাও।
ভালোবাসা বাঁধন হারা।
উনিশ-বিশে কর্মসারা না
ভরিয়ে রসের পাতিল
দুখের জাল বুনাও। [বসাকঃ ২০০২ : ১৩৯]

কবি জসীমউদ্দীনের 'নকশি কাঁথার মাঠ' কাব্যে কেন্দ্রীয় চরিত্র যেন তিনটি- রূপা, সাজু এবং নকশি কাঁথা। সাজুর প্রেমে ও অশ্রুবেদনায় গড় নকশি কাঁথাটি যেন কাহিনীর শেষে হয়ে উঠেছে মূল চরিত্র। তাই কি কবি কাব্যের নাম দিয়েছেন 'নকশি কাঁথার মাঠ'।

পল্লীবাংলা সাজু ও রূপার দাম্পত্য প্রণয়কাহিনী এই কাব্যের উপজীব্য। যে-প্রেম অমর মৃত্যুতেও তার লয় নেই, ক্ষয় নেই। পল্লীবধু সাজু তার স্বামীর পাশে বসে প্রতিদিন যে কাঁথাটি চিত্রিত করতে শুরু করেছিল, তা ছিল তাদের জীবনের হাসি-খেলা, প্রণয়ের আনন্দের রঙিন স্বপ্ন- সুতোয় গাঁথা; কিন্তু রূপার গ্রাম ত্যাগ করার পর সেই কাঁথারই চিত্রপট বদলে গেল। বিরহিনী সাজুর অশ্রুজলে ও বেদনায় কাঁথার সূর হল বেদনাবিধুর। সেই করুণ রাগিণী শেষ করল সাজু তার মৃত্যুশয্যায়-

> একটু আমারে ধর দেখি মাগো, সুঁচ সুতা দাও হাতে,
> শেষ ছবিখানা এঁকে দেখি যদি কোন সুখ হয় তাতে।

পরিশেষে মৃত্যুপথযাত্রী সাজুর অনুরোধ-

> এই কাঁথাখানি বিছাইয়া দিও আমার কবর পরে,
> ভোরের শিশির কাঁদিয়া কাঁদিয়া এরি বুকে যাবে ঝরে। [জসীমউদ্দীন : ১৯২৯: ৬৬]

নকশিকাঁথা এমন একটি শিল্পকর্ম এর আসলে দ্বিতীয়টি বলে কিছু নেই। প্রতিটি নকশি কাঁথাই অনন্য সৃষ্টি। কাঁথার প্রতি আগ্রহ দেখা যায় বিশ শতকের প্রারম্ভিক দশকসমূহে যখন স্টেলা ক্রামরিশ, গুরুসদয় দত্ত, দিনেশচন্দ্র সেন এবং জসীমউদ্দীন এ শিল্প পুনরুদ্ধার করেন। স্টেলা ক্রামরিশ কাঁথার বিষয়ে লিখেন এবং অনেক কাঁথা সংগ্রহ করেন যেগুলি বর্তমানে ফিলাডেলফিয়ার মিউজিয়াম অব আর্টে রক্ষিত আছে। গুরুসদয় দত্ত কাঁথার উপর লিখেছেন এবং তাঁর সংগ্রহ ঠাকুর পুকুরের গুরুসদয় যাদুঘরে রক্ষিত আছে। জসীমউদ্দীন দিনেশচন্দ্র সেনের জন্য কাঁথা সংগ্রহ করেন, যিনি শুধু কাঁথার উপরে লিখেই ক্ষান্ত হন নাই বরং একাধিক কাঁথার সংমিশ্রণে নকশা তৈরি করানোর প্রয়াসও পেয়েছেন। জসীমউদ্দীন ইতিমধ্যে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন নকশি কাঁথার উপরে কবিতা লিখতে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের ব্যক্তিগত সংগ্রহের মধ্যে বেশ কয়েকটি বিরল নকশি কাঁথা আছে। আমাদের দেশের শাসনতন্ত্র দলিলের প্রচ্ছদ তাঁর একটি দুর্লভ কাঁথার প্রতিকৃতি দিয়ে অলংকৃত। মোহাম্মদ সাইদুরের ব্যাক্তিগত সংগ্রহে ২৫০ খানা নকশি কাঁথা আছে। [আহমদ :২০২০ : ১২-১৩]

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালি সংস্কৃতির দেশীয় মূল অনুসন্ধানের জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। এ পরিবেশে কাঁথাসহ স্থানীয় শিল্পকলা লালন-পালন করা হয়েছিল। তবে শান্তিনিকেতনে কাঁথার কাজ প্রধানত শাড়ি অলংকরণে ব্যবহৃত হয়েছে এবং বাংলাদেশের চেয়ে বেশি বর্ণিল নকশার দিকে ঝুকেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার অব্যবহিত পর দেশের একটি অনন্য পরিচিতি সৃষ্টি ও প্রকাশ করার জন্য দেশীয় শিল্পকলার প্রতি আরও বেশি করে মনোনিবেশ করা হয় এবং ঐতিহ্যগত শিল্পকলা নিয়ে গবেষণা চলে। ঐতিহ্যগত রূপ অনুসন্ধানে পুরাতন কাঁথার শরণাপন্ন হতে হয় নূতনরূপে সাজানোর জন্য। নতুন করে গ্রামীণ' কাঁথার নকশাও করা হয়। প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গানোর জন্য বিশাল আকৃতির কাঁথা ছাড়াও পুনঃপ্রচলনের তাগিদে সমসাময়িক প্রয়োজনীয়তা মিটানোর জন্য বিছানার চাদর এবং লেপের কভার, দেয়ালে ঝুলানো কাঁথা, কুশন কভার, প্লেস ম্যাট, রুমাল ইত্যাদি নানানরূপে কাঁথা তৈরি করা হয়। শাড়ি, পোশাক এবং কুর্তার উপরে কাঁথার নকশি কাজের ব্যবহার শুরু করা হয়।

কাঁথা হল গ্রামজীবনের অপরিহার্য ও সজীব শিল্পসাধনা। কাঁথা তৈরির পেছনে কিছু কিছু বিশ্বাস ও সংস্কার পরিলক্ষিত হয়। যেমন- পল্লীবাংলার মেয়েরা উঠোনে বসে বিকেলের মধ্যে বা সন্ধ্যার পূর্বেই কাঁথা সেলাই শেষ করবেন, রাতে সেলাই করবেন না। কারণ এই বিশ্বাস যে, রাতে সেলাই করলে পরিবারে দারিদ্র্য আসবে। বিশ্বাসের সঙ্গে কিছু সংস্কারও জড়িয়ে আছে। যেমন- মুসলিম মেয়েরা শুক্রবারে কাঁথা সেলাই শুরু করবেন, মঙ্গলবার কিংবা শনিবার সেলাই শুরু করবেন না। কারণ

মুসলিমদের কাছে শুক্রবার জুম্মাবার অর্থাৎ শুভবার। হিন্দু পরিবারের মেয়েরা সপ্তাহের যে-কোনও দিন কাঁথা সেলাই শুরু করবেন, কিন্তু শনিবার কখনওই সেলাই শুরু করবেন না। কারণ তাদের বিশ্বাস বা সংস্কার হল যে, শনিবারে শুরু করলে শনির দৃষ্টি পড়বে। আবার কোনও গর্ভবতী নারী সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে কখনওই কোনও কাঁথা সেলাই করবেন না, কারণ সন্তান মারা যাবে এই আশঙ্কায়। এ ছাড়া বিশ্বাস, যে কাঁথা কোনও পরিবারে ব্যবহৃত হয়নি তা কোনও সাধু বা পীরকে দান করলে পরিবারের মঙ্গল হবে। যদি কোনও নারী কোনও কাঁথা ধর্মস্থানে দান করেন, তাহলে তাকে কাঁথার সঙ্গে আরও কিছু উপহার দিতে হয়। যেমন- হিন্দুরা দেবেন তিনটে তুলসীর মালা, পাঁচটা সাদা সুতো জড়ানো; আর মুসলিমরা দেবেন কাঁথার ঢাকনি এবং এর সঙ্গে পাঁচটা মোমবাতি, তিনটে ধূপকাঠি, একটা তসবি ও একটা গোলাপজলের শিশি। এ ছাড়াও কাঁথা তৈরির সঙ্গে আরও কিছু সংস্কার জড়িয়ে আছে। যেমন-একমাত্র বিবাহিতা নারীরাই কাঁথার নকশা তৈরি করবেন, অবিবাহিত মেয়েরা কখনওই করবেন না। যদি কোনও গর্ভবতী নারী কাঁথা সেলাইয়ের সময়ে স্বপ্ন দেখেন তা হলে তাঁর কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হবে। আবার কাঁথা সেলাইয়ের সময়ে যদি কোনও নারী ভাজা বা পোড়া খাবার খান, তা হলে কাঁথা সেলাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। এই ধরনের নানা বিশ্বাস ও সংস্কার কাঁথা সেলাইয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। [বসাক : ২০০২ : ১৬]

নকশি কাঁথা সেলাইয়ের শিল্পী গ্রামের মেয়েরা। গ্রামের মেয়েদের তৈরি বস্তু, জিনিস-নকশি কাঁথা প্রয়োজনের। তবে অন্যান্য কারুশিল্পের মত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে নকশি কাঁথার প্রত্যক্ষ যোগসূত্র ছিল না। কারণ নকশি কাঁথা ব্যবসায়িক কেনা-বেচায় প্রাচীনকাল থেকে এমনকি ৭০ এর দশক পর্যন্ত প্রবেশ করেনি। অন্তপুরের নারী তার কাজের অবসরে বিশেষ করে বর্ষার কালে একান্তই নিজ সংসারের বরের জন্য, প্রিয়জনের বা পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের জন্য নকশি কাঁথা সেলাই করতো। এ প্রসঙ্গে দীনেশ চন্দ্র সেনের মতামত "কখনো কখনো স্নেহ ও ভালবাসা ইহার একমাত্র প্রেরণা দিয়েছে। স্বামী ও পুত্রকে দিবার জন্য রমণীরা দিনরাত পরিশ্রম করিয়া কাঁথা সেলাই করতেন"। ফলে গ্রামীণ লোকজীবনে, লোকমেলায়, হাটে, বাজারে নকশি কাঁথা কখনো কেনা বেচা হয়নি। কেবল পরিবারের প্রয়োজনেই নারী নকশি কাঁথা সেলাই করেছে। তবে এখানে উল্লেখ্য যে নারী পরিবারের সদস্যদের জন্য কাঁথা সেলাই করেছে। [আলম : ২০১০ : ৮৭]।

নকশি কাঁথা ছিল একান্তই অন্তপুরের, নকশি কাঁথা তৈরির উপকরণের বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যের প্রচলিত কৌশল এই লোক কারুশিল্পটিকে ব্যবসায়িক থেকে দূরে রেখেছিল।

লোকজীবনের-লোকসংস্কৃতির সাংস্কৃতিক উপাদান নকশি কাঁথাও কালিক ব্যবধানে পরিবর্তিত রূপে, বৈশিষ্ট্যে নগরজীবনের অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে। পরিণত হয়েছে বাণিজ্যিক পণ্যে। পশ্চিমা উন্নত দেশের নগর সমাজ, উপজাতীয় এবং অনুন্নত তৃতীয় বিশ্বের দেশের সাধারণ মানুষের লোকজ ঐতিহ্যের শিল্পকলা- লোকশিল্প, লোকসংস্কৃতিকে জানার আগ্রহ দেখিয়েছে এবং সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোকে পর্যটনের পণ্য হিসেবে পরিগণিত করেছে। লোকশিল্পের জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের শিল্পকলাসমূহ ক্রমশ উন্নত দেশের বাজারের উপহার পণ্য হিসেবে জনপ্রিয়তা এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর লোকশিল্পের জিনিসের বিদেশে উপহার পণ্য হিসেবে চাহিদা বাড়ায় বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে লোকশিল্পের, কারুশিল্পের দ্রুত সরবরাহ নিশ্চিত করতে উৎপাদনে আমুল পরিবর্তন আনা হয়। এছাড়া পশ্চিমা দেশগুলোর ক্রেতা, ভোক্তাদের জীবনধারার চাহিদা, রুচিমাফিক সরবরাহ নিশ্চিত করতে গিয়ে লোক ও কারুশিল্পের ঐতিহ্যের ধারা তৈরিতে, গড়নে, নকশায় ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন আনা হয়। এর ফলে ঐতিহ্যের লোক ও কারুশিল্পের দ্রুত রূপান্তর ঘটে।

বাংলাদেশেও অনুরূপভাবে নকশি কাঁথা বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে ঢাকায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসহ বড় বড় দোকানে বিক্রি হচ্ছে। ফলে নকশি কাঁথার উৎপাদনের গতি বৃদ্ধিতে উপকরণ ও নকশা চয়নে পরিবর্তন এবং সেলাই কৌশলে নতুন তত্ত্ব, অন্য কৌশল সংযোজন হয়েছে। পুরানো

কাঁথা থেকে এসব কাঁথার একটা মৌলিক পার্থক্য সূচিত হয়েছে। এত কিছুর পরও এসব বাণিজ্যিক নকশি কাঁথায় ঐতিহ্যের পুরানো নকশি কাঁথার কতগুলো মৌলিক উপাদান, বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে। যেমন এই ব্যবসার নকশি কাঁথা গ্রামের গরীব মেয়েরাই সেলাই করে। আর সেলাই কৌশল ও দক্ষতার ঐতিহ্য সক্রিয়। ফলে নকশি কাঁথায় আজ অবধি রূপান্তর ধারায় ঐতিহ্যের একটি ধারাবাহিকতা আছে। এজন্যই নকশি কাথার রূপান্তর ধারা প্রবহমান। ভবিষ্যতেও সচল প্রবহমান থাকতে, রূপান্তরিত হতে প্রস্তুত। শিল্পী এখানে ব্যক্তি নারী নয় আবহমান বাংলার লোকজীবন ধারার নারী সমাজের একজন। লোকজীবন ধারার অংশ নারী তার পূর্বপুরুষ প্রাচীন মাতামহীদের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সেলাই কৌশল, মোটিফ, নির্মাণপদ্ধতি, সুতিবস্ত্রকে সম্বল করে এই রূপান্তর ধারায় ক্রমপুঞ্জিত ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নকশি কাঁথাকে প্রবহমান রাখবে। [আলম: ২০১০ : ৮৯]

নকশি কাঁথায় লোক-মানসিকতার প্রকাশ ঘটে বলেই একটি জাতির সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও ধর্মীয় অনুভূতিকে আবিষ্কার করা যায়। এই প্রসঙ্গে কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় বলেছেন: Though every Kantha is functional and founded on thrift, it is imbued with so much romance, sentiment and philosophy that it transcends the orbit of a mere craft as does a painting or sculpture. [Kamaladevi Chattopadhaya : Indian Embroidery, New Delhi, 1977, p. 591। বিষয়বস্তু, নকশা, অঙ্কন, গঠন ও ব্যবহারে এই শিল্পে নির্দিষ্ট সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটে। এটি বঙ্গনারীর সূচিজাত একান্ত নিজস্ব হস্তশিল্প। উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁরা এই সেলাইয়ের জ্ঞান অর্জন করেন। সাধারণত কাঁথা সেলাইয়ের মরশুম হল বর্ষাকাল। কারণ বর্ষার জলে গ্রাম্য এলাকা ডুবে থাকে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তখন মেয়েরা বাড়ির বাইরে যান না। এরকম পরিবেশে পল্লীরমণীরা ঘরের কাজ-কর্ম সেরে, দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর নিশ্চিন্ত মনে কাঁথা সেলাই করতে বসেন। কাঁথা সেলাইয়ের সময় সম্পর্কে শহীদুল্লাহ্ বলেছেন : Woman generally devote their leisure time in the midday and the evening to this work. [আনিসুজ্জামান: ১৯৯৪: ২৫৯)।

কাঁথা বঙ্গনারীর সৌন্দর্যবোধের পরিচায়ক। তাই কাঁথার ছেঁড়া অংশ কাঁথাশিল্পীর শিল্পনৈপুণ্যে চমৎকারভাবে ঢাকা পড়ে যায়। নকশি কাঁথা সেলাই করার সময় জোড়ের অংশ এমন সুক্ষ্ম অথচ নিপুণভাবে গুপ্ত থাকে, যাতে জোড়ের সংযোগস্থল বুঝতেই পারা যায় না। আবার যখন চিত্রায়তি নকশা অত্যধিক বিস্তারিত করা হয়, তখন চিত্তাকর্ষক ভাবান্তর উদ্রেকের ইচ্ছাকে প্রশমিত রাখার জন্য এক রঙের সুতো (সাদা অথবা হালকা নীল) ব্যবহার করা হয়। কাঁথার এই বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেন (নকশাগুলির মূলে একটা ঐক্য এবং সন্নিবদ্ধতা (System) সহজেই চোখে পড়ে। কাঁথার গায়ে ফোটানো এইসব নকশাগুলি কাঁথার ব্যবহারিক দিকটাকে অনুল্লেখযোগ্য করে এর ইঙ্গিতময়তার দিকটাকেই বড করে তোলে। কাঁথার বৈশিষ্ট্য সাধারণ সুচিশিল্প থেকে কাঁথা-শিল্পকে একটু কৌলিন্য সম্পন্ন এবং স্বতন্ত্র করে রেখেছে। [গঙ্গোপাধ্যায় : ১৩৬৮ : ৬৬]।

বঙ্গললনাদের হাতে তৈরি কাঁথাগুলির মধ্যে শিল্পীর শান্ত-সৌম্য দৃষ্টিভঙ্গি, আনন্দঘন আত্মনিবেদন সহজেই প্রকাশ পায়। কাঁথাগুলি তাঁদের মিতব্যয়িতা, সৌন্দর্য-প্রেমিকতা এবং তাদের শিল্পকলায় উৎকর্ষের পরিচয় বহন করে। কাঁথার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রুবী গজনবী চমৎকার কাঁথা বলেছেন: Though its origin is uncertain, the Kantha is an example of strange contradictions. An endeavour of thrift inasmuch as it is the re-use of old fragments, it is at the sametime a product expressing the devotion and rare skill of the maker. (Sayyada R. Ghuznavi : Naksha : A collection of designs of Bangladesh, Dhaka 1981, p. 23]

কাঁথা প্রাচীন শিল্প। কাঁথার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে প্রভাস সেন বলেছেন: The tradition of Kantha embroidery is very old. It is mentioned in the definitive Sanskrit grammer written by

Panini around the sixth century B.C. and also in the epic Ramayana of Valmiki about two centuries later. The earliest mention of Kanthas in Bengali literature is found in the Charyapadas-the earliest known verses in an old form of Bengali that prevailed from the 8th to 11th centuries A.D. (Probhas Sen : Crafts of West Bengal, Ahmedabad, 1994, p. 56] । [বসাক: ২০০২: ১৫: ১৬]

দীনেশ চন্দ্র সেন বাংলার লোকশিল্প তথা কাঁথা নিয়ে আলোচনা করতে যেয়ে বলেছেন "যে সকল শাড়ী পুরাতন হইয়া ছিঁড়িয়া যাইত, তাহা ফেলিয়া না দিয়া নিম্ন শ্রেণীর এবং সময়ে সময়ে বিপন্ন মধ্যবিত্ত অবস্থার গৃহলক্ষ্মীরা তাহার দ্বারা এই কাঁথাগুলি সেলাই করিতেন ইহা বিক্রয় করিয়া তাঁহারা কায়কষ্টে জীবিকা চালাইতেন। কখনও কখনও স্নেহ ভালবাসাই ইহার একমাত্র প্রেরণা দিয়েছে। স্বামী ও পুত্রকে দিবার জন্য রমণীরা দিনরাত পরিশ্রম করিয়া কাঁথা সেলাই করিতেন। সেই পুরাতন শাড়ী ও ছিঁড়া শাড়ীর পাড়ের নানা রঙ্গের সুতা এবং সূচ মাত্র ছিল ইহার উপাদান। ইহাতে একটি পয়সাও ব্যয় হইত না, অথচ যে শিল্প কৌশল ও সহিষ্ণু পরিশ্রমে এক এক খানি কাঁথা তৈরি হইত। এদেশ ছাড়া অন্য কোন দেশে কোন রমণী কোন কালে এরূপ তুচ্ছ উপকরণ দিয়া সম্পাদন করিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। [ইসলাম : ২০১৬: ২৭]

কাঁথার শিল্পীরা কোনও স্কুল-কলেজে এসব শেখেন না, বাড়ির বর্ষীয়ান মহিলা অর্থাৎ ঠাকুমা-দিদিমা, মাসিমা-পিসিমী কিংবা স্থানীয় কোনও বর্ষীয়ান মহিলার কাছে এবং মায়ের কাছে কাঁথা সেলাই করতে শেখেন। নানাবিধ মোটিফ বা চিত্রণের মাধ্যমে। সাধারণ কাঁথা রূপান্তরিত হয়, নকশি কাঁথায়। কাঁথার নকশা সম্বন্ধে স্টেলা ক্রামরিশ বলেছেন: The design of the Kanthas provides wide margins for showing the contents of a woman's mind. Their figures and symbols are freely associated and rhythmically assembled. Unknown India : Exploring India's Sacred Art: (Kramrisch : 1994:110] দীনেশ চন্দ্র সেন বলেন, সামান্য শাড়ী ও ছেড়া কাপড়ের উপর কত চিত্র-বিচিত্র কারুকার্য্য দেখাইয়া তাঁহারা যে কাঁথা ও বালিশের খোল, পানের বটুয়া তৈরী করিতেন তাহাতে তাহাদের শয্যাগৃহ ছিল চিত্রশালা। [সেন: ১৯৯৩: ৪২৬]

নকশি কাঁথার স্বরূপ বিশ্লেষণ করে আসলে এই কথা বলা যায় যে, এক সময় গ্রামীন নারীরা তাদের বিভিন্ন কাজের অবসরে সুঁই-সুতা আর পুরনো কাপড়কে উপজীব্য করে যে কাঁথা তৈরি করেন সেগুলো প্রতিটি ছিল অনন্য এক শিল্পকর্ম। প্রতিটি কাঁথা এক ব্যক্তি বিশেষের মনোজাগতিক নান্দনিক বোধের প্রতিফলন। কাঁথায় প্রস্ফুটিত প্রতিটি মোটিফ অথবা বিষয়বস্তু শিল্পী তার চারপাশের পরিবেশ থেকেই গ্রহণ করেন। কখনো তার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাও চিত্রের বিষয় হয়েছে। প্রতিটি কাঁথাই যেন এক একটি চিত্রপট। বিশিষ্ট জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গের সুযোগ্য সিদ্ধান্তের দ্বরুণ এই কাঁথা আজ জাদুঘরের সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে ঠিকই কিন্তু কালের প্ররিক্রমায় আজ কজন কাঁথা শিল্পীকে আজ খুঁজে পাওয়া যায়! আজকের বিজ্ঞানের আশির্বাদের বিভিন্ন আবিষ্কার কাঁথা শিল্পীর অবসর যাপনকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যার কারনে আগের মতো আর নকশি কাঁথা তৈরি হচ্ছে না। যদিও বিভিন্ন সংস্থা - ব্র্যাক, কুমুদিনী এবং আরও কিছু প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে কাঁথা শিল্পকে পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছে; তবুও সেখানে ঐতিহ্যবাহী নকশি কাঁথার মৌলিকতা বা স্বকীয়তা কতখানি রক্ষা হল তা ভাবনা বিষয়। বৃহৎ এবং জাতীয় পর্যায়ে উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমেই এর পুনরুদ্ধার কিছুটা হলেও সম্ভব হবে, হয়তো।

তথ্য সহায়িকা গ্রন্থাবলী :

আকন্দ, শাওন, বাংলাদেশের লোকশিল্পের রুপরেখা, ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

আলম মাহবুব, সৈয়দ, নকশি কাঁথার অতীত, বর্তমান এবং রুপান্তরের ধারা, সম্পাদক: রবীন্দ্র গোপ, লোকশিল্পের নির্বাচিত প্রবন্ধ, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, মার্চ ২০১০।

আহমদ, তোফায়েল, লোকশিল্প : সংগ্রহ ও শনাক্তকরণ সমস্যা, সম্পাদক: আহমেদ উল্লাহ, লোক ও কারুশিল্প পত্রিকা, জানুয়ারি-জুন সংখ্যা, ২০২০, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ২০২০।

আহমেদ, তোফায়েল, নকশি কাঁথা, শিল্পকলা পত্রিকা, ষষ্ঠদশ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ঢাকা-১৯৯২।

আহমেদ, পারভিন, হৃদয়ে উৎসারিত শিল্পকলা : প্রাচীন নকশিকাঁথার প্রদর্শনী, বাংলাদেশের গৌরবগাথা আমাদের এই নকশিকাঁথা, সম্পাদক : রবীন্দ্র গোপ, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, জানুয়ারি ২০১৬।

ইসলাম, মোঃ রবিউল, কাব্যময় স্মৃতিকথা- নকশি কাঁথা, বাংলাদেশের গৌরবগাথা আমাদের এই নকশিকাঁথা, সম্পাদক : রবীন্দ্র গোপ, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, জানুয়ারি ২০১৬।

ক্যাটলগ, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী ও বাংলাদেশ শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন এবং মোহাম্মদ সাইদুর রহমানের সংগ্রহের 'নকশি কাঁথা প্রদর্শনী', বৈশাখ, ১৩৯০।

কর্মকার, প্রতিভা রানী, সায়েম, আতাউর রহমান, আবহমান বাংলার লোকশিল্পের ঐতিহ্য- দিনাজপুর অঞ্চলের নারীদের ভূমিকা, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণা ত্রৈমাসিক, জানুয়ারি-জুন ২০১৪, জুন ২০১৬।

গঙ্গোপাধ্যায়, কল্যাণকুমারঃ বাংলার লোকশিল্প, ১৩৬৮।

জামান, নিয়াজ, নকশি কাঁথা, সম্পাদক: লালারুখ সেলিম, চারু ও কারুকলা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ডিসেম্বর ২০০৭।

দক্ষিণারঞ্জন রচনা সমগ্র, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮৬।

বসাক, শীলা, বাংলার নকশিকাঁথা, জানুয়ারি ২০০২।

লোকশিল্প এ্যালবাম, তোফায়েল আহমদের বাংলাঘর থেকে নির্বাচিত সংগ্রহ, সম্পাদনা পরিষদ: মনসুর মুসা, মুহম্মদ নুরুল হুদা, শফিকুর রহমান চৌধুরী, শাহিদা খাতুন, বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর ২০০৪।

সাহা, চন্দ্রশেখর, নকশি কাঁথার আলোকিত ভূবন, বাংলাদেশের গৌরবগাথা আমাদের এই নকশিকাঁথা, সম্পাদক : রবীন্দ্র গোপ, বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন, জানুয়ারি ২০১৬।

সিদ্দিকী, আশরাফ, নকশি কাঁথা, লোক কারুশিল্প মেলা ও উৎসব' ৯৫, সোনারগাঁও।

সেন, দীনেশচন্দ্র, বৃহৎ বঙ্গ, প্রথম খণ্ড, ১৯৯৩।

Ahmad, Perveen, Bangladesh Katha Art in the Indo-Gangetic Matrix, Bangladesh National Museum, Augsut 2009.

Dutta, Gurusaday : Folk Arts and Crafts of Bengal : The Collected Papers, Calcutta, 1990.

Mookherjee, Ajit: Folk Art of Bengal, Calcutta, 1946.

Selected Writings of Stella Kramrisch, Ed. by Barbara Stoler Miller, New Delhi, 1994, p. 110.

[Abstract : The tradition of Nakshi Kanthas hand made by village women of rural Bangladesh cannot be judeged by any specific by any specific standard and the scope of its artistic qualities is so vast that it is to possible to describe it in a short scale. It is an art in which a woman expresses her emotions through various forms, motifs, designs and manifest in the game Colors.

The image of our Bangladeshi cultural heritage emerges in the underlying message move all these Nakshi Kanthas made without any kind of formal education.]